প্রবন্ধ-মালা।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

কলিকাতা ;

জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানীর যন্ত্রে মুদ্রিত।

২১ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীট্।

১২৮৪ সাল।

সূচী।

প্রবন্ধ-মালা।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

কলিকাতা;
জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানীর যন্ত্রে মুদ্রিত।
২১ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীট্।

১২৮৪ সাল।

প্রবন্ধ-মালা পাঁচটী প্রবন্ধের সংগ্রহ। ইহার মধ্যে "অন্ধদিগের শিক্ষা ও জীবনোপায়" শীর্ষক প্রবন্ধ এবং "রামায়ণের সাধারণ ধর্ম্ম ও নীতি" শীর্ষক প্রবন্ধের নীতি অংশ হিন্দু মেলার বিজ্ঞাপনানুসারে লিখিত হইয়া পুরস্কৃত হইয়াছিল। অপর গুলি অবকাশমত লিখিত হইয়াছে। সর্ব্ব শেষ দুটী ব্যতীত অপর প্রবন্ধ গুলি ইতিপূর্ব্বে জ্ঞানাঙ্কুর, আর্য্য দর্শন, বান্ধব ও হিন্দুমেলার পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রবন্ধ-মালার পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয় গুলি সাধারণতঃ প্রেস্‌কট্‌, কর্ণেল টড্‌, গোরেসিও, মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্‌, মালকম্‌, কানিংহাম্‌, ম্যাক্‌গ্রেগর প্রভৃতির গ্রন্থ এবং এসিয়াটিক রিসার্চ্চেস্‌, আর্কিয়লজিকাল্‌ রিপোর্ট, কলিকাতা রিভিউ, রহস্য সন্দর্ভ প্রভৃতি পুস্তক ও সাময়িক পত্র প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইত্যলং।

কলিকাতা।
হিন্দুহোষ্টেল।
২৬এ আশ্বিন, ১২৮৪।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

সূচী।

বিষয়। | | পৃষ্ঠা।

অন্ধদিগের শিক্ষা ও জীবনোপায়।

যাহারা দুই চক্ষে কিছুই দেখিতে পায় না, তাহাদিগকে অন্ধ কহে। অন্ধত্ব কি মর্ম্মান্তিক ক্লেশের আকর! কি দুরপনেয় যন্ত্রণার নিদান! অন্ধগণ জগতের সমুদয়ই গাঢ় তমসাচ্ছন্ন বলিয়া অনুভব করে। সহস্ররশ্মির প্রতপ্ত কাঞ্চন-ময়-সুত্র-সন্নিভ কিরণজাল, হিমাংশুর নয়ন-রঞ্জন কমনীয় মূর্ত্তি, নৈশ গগন-বিকশিত মুক্তাচ্ছ তারকা প্রভৃতি দর্শন-লোভনীয় পদার্থ সমূহ অন্ধগণ সমীপে তমসাবগুণ্ঠিত-রূপে প্রতীত হয়। বসুধা যেন তামসময়ী হইয়া তাহা-দিগের নিকট অবস্থিতি করে। চক্ষুহীনদিগকে সর্ব্বদাই পর-প্রত্যাশী হইয়া থাকিতে হয়। স্থানান্তরে গমনাগমন প্রভৃতি অনেক কার্য্যই অপরের সাহায্যসাপেক্ষ, অন্যথা তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াথাকে।

অন্ধদিগের সহানুভূতি নিতান্ত হীন-ভাবাপন্ন। স্বয়ং দর্শন না করিলে অপরের শারীরিক চেষ্টাগত ভাব কথনই সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না। দুঃসহ যন্ত্রণা-প্রকাশক বিকার, অথবা অনুপম আনন্দজনক তুষ্টি উভয়ই প্রায় আকৃতিগত ভাব দ্বারা অনুমিত হইয়া থাকে। সুতরাং

উক্ত উভয়বিধ জ্ঞানই দর্শন-সাপেক্ষ। কিন্তু অন্ধগণ এ বিষয়ে একান্ত বঞ্চিত। সুতরাং তাহাদিগের সহানুভূতি যে হীনতর হইবে, সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। অন্ধগণ এই সহানুভূতির অভাব নিবন্ধন ঈশ্বরের সত্ত্বাতেও অবিশ্বাস করিয়া থাকে। সুবিখ্যাতনামা সর আইজাক্ নিউটনের সমকালে সণ্ডার্সন নামক এক জন প্রসিদ্ধ অন্ধ গণিতবেত্তা ছিলেন। তিনিও সহজজ্ঞানে ঈশ্বরের সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাঁহার অন্তিম সময়ে এক জন ধর্ম্মোপদেষ্টা ঐশ্বরিক ভাব মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া দিবার প্রয়াস পাওয়াতে আসন্ন-মৃত্যু সণ্ডার্সন বলিয়াছিলেন, "হায়! আমি সমস্ত জীবন কেবল অন্ধকার মধ্যেই অতিবাহিত করিলাম। প্রকৃতির কৌশল আমাকে আকাশ-কুসুম-সদৃশ ফল প্রদান করিল। আপনি যে সমস্ত ঐশ্বরিক তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছেন, তাহা কেবল আপনি ও আপনার ন্যায় ব্যক্তিগণই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।"

গণিতবেত্তার এই নাস্তিকতা-প্রকাশক বাক্য শ্রবণ করিয়া উল্লিখিত ধর্ম্মোপদেষ্টা তৎসমকালীন নিউটন প্রভৃতির ধর্ম্মভাব ব্যক্ত করিলে সণ্ডার্সন উত্তর করিয়াছিলেন :—
"নিউটন প্রকৃতির বিচিত্র কৌশলময় কার্য্য সন্দর্শন করিয়া ঈশ্বরের সত্ত্বা অনুভব করিযাছেন, কিন্তু আমার পক্ষে তাহা প্রবল নহে। যাহা হউক, এক্ষণে নিউটনের বিশ্বাস্য 'পরমেশ্বর' পদটীতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইল।" পরিশেষে এই গণিতবেত্তা "হে নিউটনের ঈশ্বর! অন্তিম সময়ে আমাকে তোমার করুণার আস্পদ কর" বলিয়া পরলোক-

গত হইয়াছিলেন। এতদ্দারা স্পষ্ট অনুভুত হইতেছে, জন্মান্ধগণ এক প্রকার নাস্তিকের ন্যায় কালাতিপাত করে। কেবল ইহাই তাহাদিগের শোচনীয় দশার পরিণাম নহে, দর্শন-শক্তির অভাব নিবন্ধন অসহনীয় যন্ত্রণায় পীড়িত হইয়া ইহারা সর্ব্বদা করুণ-রসপূর্ণ বিলাপে জনগণের হৃদয় ব্যথিত করিয়া থাকে। কবিকেশরী মিল্টন স্বপ্রণীত "স্বর্গভ্রষ্ট" নামক লোক-বিশ্রুত মহাকাব্যে স্বীয় দুঃসহ অন্ধত্ব লক্ষ্য করিয়া এই ভাবে আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন, "বৎসরের সহিত ঋতু সকল প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে, প্রকৃতি প্রতি ঋতুতে নব নব ভূষায় ভূষিত হইয়া জনগণের নিকট উপস্থিত হইতেছে; কিন্তু হায়! আমার নিকট কিছুই প্রত্যাবর্ত্তিত হইতেছে না। সুকোমল-অরুণরাগ-বিভাসিত প্রাভাতিক লক্ষ্মী, দিবস-পরিণাম-সম্ভূত নয়নরঞ্জন সায়ন্তন শ্রী, সুশোভন বাসন্ত দৃশ্য, গ্রীষ্ম-সম্ভূত সুরম্য পুষ্পশ্রেণী এবং স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য-বিলসিত মানব-বদন প্রভৃতি কিছুই প্রত্যাগত হইতেছে না। এই সকলের পরিবর্ত্তে কেবল ঘোর অন্ধকার আমাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। আমি মানবগণের প্রীতিপ্রদ কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছি। আমার নিকট প্রকৃতির জ্ঞান গর্ভ পুস্তক শূন্য-ময় হইয়া অবস্থান করিতেছে, এবং দর্শন জ্ঞানের পথ নিরন্তর অবরুদ্ধ রহিয়াছে।"

ফলতঃ অন্ধগণ বহুবিধ কষ্ট ও অশান্তি অনুভব করিয়া থাকে। স্বাধীন ভাবে জীবিকা সংস্থান করা এই দুর্ভাগ্যদিগের নিতান্ত ক্লেশসাধ্য বলিয়া আশু অনুমিত হয়। কিন্তু

স্থিরচিত্তে উপায়ানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে ইহা তাদৃশ কষ্টকর বলিয়া প্রতীত হইবে না।

অন্ধত্ব যেমন কতিপয় ক্লেশ-সমষ্টির নিদান, সেইরূপ কয়েকটী সদ্‌গুণ-সমষ্টিরও আকর। অন্ধত্বাবস্থায় স্মৃতি-শক্তির তীব্রতা সাধিত হয়, মনোযোগের আধিক্য হয় এবং কল্পনা ও চিন্তা-শক্তির সবিশেষ উৎকর্ষ হইয়া থাকে। পরন্তু বাহ্য জগৎ অন্ধদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না বলিয়া অন্তঃকরণের বিশিষ্ট স্থিরতা সাধিত হয়। মালব্রান্স্-নামা একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি কোন বিষয়ে প্রগাঢ়-রূপে মনঃসংযোগ করিবার সময়ে সূর্য্যালোক প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত গৃহের গবাক্ষ সমূহ রুদ্ধ করিতেন, এতন্নি-বন্ধন অবস্থান-গৃহ অন্ধকারময় হইয়া তাঁহার চিন্তাশক্তির বিশিষ্ট অনুকূলতা সাধন করিত। অপিচ দৃষ্টি শক্তি না থাকাতে অন্ধগণ কোন লিখিত বিষয় স্বয়ং পাঠ করিয়া তাহার মর্ম্ম অবগত হইতে পারে না, সুতরাং তাহারা অবি-চ্ছিন্ন মনোযোগ সহকারে অপরের পাঠ শ্রবণ করে এবং পাঠ সমাপ্ত হইলেও শ্রুত বিষয়গুলি মনোমধ্যে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া স্মৃতি-পথবর্ত্তী করিতে সবিশেষ প্রয়াস-বান্ হয়। এই রূপে স্মৃতি, মনোযোগ ও চিন্তা তিনটীই সমভাবে চালিত হওয়াতে সকল গুলিই সতেজ হইয়া উঠে। প্রথিত আছে ডিমক্রিতস্ নামক এক জন বিজ্ঞানবেত্তা এই সমস্ত গুণ পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত স্বীয় চক্ষুর্দ্বয় উৎ-পাটিত করিয়াছিলেন। চিন্তা-শক্তির প্রগাঢ়তা নিবন্ধন অন্ধদিগের কবিত্ব ও গণিতশাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শিতা

জন্মিয়া থাকে। ইংলণ্ডের কবিকুল চূড়ামণি মিল্টন অন্ধত্বাবস্থায় 'স্বর্গভ্রষ্ট' নামক অত্যুৎকৃষ্ট ভুবন-মোহন কাব্য প্রণয়ন করিয়া কবিত্বশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্ণিত আছে, গ্রীস্ দেশীয় মহাকবি হোমর অন্ধ ছিলেন, কিন্তু তিনিও বীররসাত্মক 'ইলিয়াদ' কাব্য প্রণয়ন করিয়া জগৎ-বিশ্রুত হইয়াছেন। সণ্ডার্সনের বিষয় এক বার লিখিত হইয়াছে; তিনি যে কেবল দৃষ্টিশক্তি-বিহীন ছিলেন এরূপ নহে, তাঁহার দর্শনেন্দ্রিয় মাত্রও ছিল না। কিন্তু পরিশেষে এই অন্ধ মহানুভব স্বাবলম্বন-বলে বিজ্ঞান ও গণিত বিদ্যায় তৎসমকালে অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন লোক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অধিক কি এই মহাত্মাই কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে জগদ্বিখ্যাত সর্ আইজক্ নিউটনের আসন পরিগ্রহ করিয়া অন্তেবাসী-বর্গকে যথারীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। এতন্নিবন্ধন সণ্ডার্সনকে জীবিকা নির্ব্বাহ বিষয়ে কোন প্রকার কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। ইনি অধ্যাপনা কার্য্যে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পোষ্যবর্গেরও ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। আমেরিকা-বাসী বিখ্যাত গ্রন্থকার প্রেস্‌কটের নাম অনেকেই শ্রবণ করিয়াছেন; বাগ্দেবীর এই স্নেহাস্পদ পুত্রও সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া একরূপ অন্ধত্বাবস্থায় কালাতিপাত করেন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সময়ে এই মহা-মনস্বী একচক্ষুহীন হয়েন, পরিশেষে ঘটনা বশতঃ অন্য চক্ষুটীরও দুই বার দর্শন-শক্তি বিলুপ্ত হয়। প্রেস্‌কট এইরূপ বিপন্ন অবস্থাতেও কতিপয় ইতিবৃত্ত-মূলক

প্রস্তাব রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই প্রশস্তমনা ব্যক্তি অন্ধনিবাস বিষয়ে একটী মনোহর প্রবন্ধ লিখিয়া অন্ধত্বকে বধিরতা অপেক্ষা সৌভাগ্য-সমন্বিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইউলার অন্ধ ছিলেন; কিন্তু তিনিও বিখ্যাত গণিত ও বিজ্ঞানবেত্তা বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

অন্ধদিগের যেমন মনঃসংযম প্রভৃতি গুণের উৎকর্ষ হয়, সেইরূপ স্পর্শজ্ঞানেরও অসাধারণ তীব্রতা সাধিত হইয়া থাকে। অনেক অন্ধ কেবল হস্ত-পরামর্শ দ্বারা পদার্থ সমূহের বর্ণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়। কেবল ইহাই নয়, ইহাদের অনেকে প্রকৃত চক্ষুষ্মানের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। এরূপও অবগত হওয়া গিয়াছে, যে ইহারা ঘোর অন্ধকারময় রজনীতে পথ-প্রদর্শকের কার্য্য করিয়া পথিকদিগকে গন্তব্য স্থানে রাখিয়া আসিয়াছে। ডাক্তার বিউ উল্লেখ করিয়াছেন, ডার্ব্বিসায়ারে তাঁহার পরিচিত একটী অন্ধ রাত্রিকালে তুষারময় বক্র পথ দিয়া পথিকদিগকে লইয়া যাইতেন, পরিশেষে ইনি পথের জরিপী কার্য্যে নিয়োজিত হয়েন। প্রসিদ্ধ স্থপতি ম্যাক্‌ডফ্ অন্ধ ছিলেন। তিনিও এইরূপ পথ-প্রদর্শকের কার্য্য করিয়া পথিকদিগকে চমৎকৃত করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু ইনি স্থপতি-বিদ্যাতেও জনসমাজে খ্যাতি লাভ করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

একটী ইন্দ্রিয়-শক্তি হীনভাবাপন্ন হইলে অপর শক্তিগুলি সহজেই সতেজ ও স্বকর্ম্মপ্রবণ হইয়া উঠে। সুতরাং অন্ধদিগের অন্যান্য জ্ঞানশক্তি গুলি যে অপেক্ষাকৃত প্রবল

ও তেজস্কর হইবে, সহজেই অনুমিত হইতে পারে। অন্ধদিগের ইন্দ্রিয় বিশেষের শক্তির বিষয় শ্রবণ করিলে অবাক্ ও হতবুদ্ধি হইতে হয়। অন্ধ বিজ্ঞানবেত্তা ডাক্তার ময়সি কোন বন্ধুর পরিহিত পরিচ্ছদের বর্ণ কেবল আঘ্রাণ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। উত্তর আমেরিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী ইউনাইটেড্‌ষ্টেটস্-বাসী অধ্যাপক আপ্‌হাম উল্লেখ করিয়াছেন, হার্টফোর্ডস্থ অন্ধনিবাস-বাসিনী একটী বালিকা কেবল হস্তপরামর্শ দ্বারা রজকীর বস্ত্রের বস্তা হইতে নিজের বস্ত্রগুলি চিনিয়া লইত। ডাক্তার রাস্ বর্ণন করিয়াছেন, ফিলাডেলফিয়া নগরের দুইটী অন্ধ ভ্রাতা পথ চলিবার সময় অগ্রপথবর্ত্তী প্রোত শঙ্কু ইত্যাদি থাকিলে তাহা জানিতে সমর্থ হইত। পরন্তু এই ভ্রাতৃদ্বয় অপূর্ব্ব সংস্কার-বলে মস্তকোপরি উড্ডীয়মান ক্রীড়া-কপোতের সংখ্যাও নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিত। সুবিখ্যাত বিজ্ঞান ও গণিতবেত্তা সণ্ডার্সন অসাধারণ স্পর্শশক্তিবলে পুরাতন এবং অনুকৃত নূতন পদক সমূহ বিভেদ করিয়া দিতে পারিতেন। এই ধীশক্তিসম্পন্ন অন্ধ মহানুভব যখন উদ্যানে বসিয়া জ্যোতিষ বিদ্যার আলোচনা করিতেন, তখন আকাশমার্গ-পরিচালিত মেঘখণ্ড নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া দিতেন।

কেবল ভিন্ন দেশের মুখাপেক্ষা না করিলেও আমাদিগের দেশ হইতে অন্ধদিগের ঈদৃশ অসাধারণ শক্তি বিশেষের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী পরম ভাগবত সুরদাস অন্ধ ছিলেন। তিনিও এই অন্ধত্বাবস্থায় দশ সহস্র পদাবলি রচনা করিয়া লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইয়া-

ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ের মধ্যেও ঈদৃশ ব্যক্তি অবিরল নহেন। নদীয়া জেলার রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী আঁসুলিয়া নিবাসী দীননাথ নামক জনৈক ব্যক্তি চারি মাস বয়ঃক্রম কালে হাম রোগে অন্ধ হয়েন। পঠদ্দশায় ইনি ১২৭২ কি ৭৩ সালে কাশীতে গমন করেন। সেই স্থানে অবস্থান কালে সর্ব্বদা গুরুর সন্নিধানে বসিয়া থাকাতে ৬ খানি উপনিষদ্ অন্বয় ও ব্যাখ্যা সহ মুখস্থ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইহাঁর কবিত্ব ও সঙ্গীতেও বিলক্ষণ পারদর্শিতা আছে। স্বয়ং নানাবিষয়ে গীত রচনা করিয়া তানলয়-বিশুদ্ধ স্বরে গান করিতে পারেন। এইস্থলে দীননাথের বিরচিত একটী গানের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

"আমি এসেছি যারো আদেশে,
যাব কোথা তার উদ্দেশে।
নিজ স্নেহগুণে, বান্ধি জীবগণে,
কে পালে যতনে, আছে জগত
মোহিত, কার প্রেমাভাষে।"

সম্বাদ পত্রপাঠে অবগত হওয়া গিয়াছে, নদীয়া জেলার অন্য একটী অন্ধ অধ্যাপক অসাধারণ মেধা ও মনঃ-সংযম বলে সংস্কৃতে পারদর্শিতা লাভ পূর্ব্বক স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবসায় করিয়া ছাত্রদিগকে নিয়মিতরূপে শিক্ষা দিয়াছেন। এই জেলার অন্য একটী অন্ধ বৈদ্য ঔষধের বাক্স হইতে পীড়িতদিগকে যথাযোগ্য ঔষধ দিতেন, ইহাঁর স্পর্শ জ্ঞান এমনই তীক্ষ্ণ ছিল যে, ইনি নাড়ী দেখিয়া লোক চিনিতে পারিতেন। এবিষয়ে একটী কৌতুকাবহ গল্প আছে,

একদা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইঁহার স্পর্শশক্তি পরীক্ষা করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া জনৈক ভৃত্যকে নিজের সুসজ্জিত ও সুপরিষ্কৃত শয্যায় শায়িত করেন, এবং তাহার আপাদ-মস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া চিকিৎসককে ডাকিয়া পাঠান; চিকিৎসক গৃহ-স্বামীর পীড়া হইয়াছে শুনিয়া এই শয্যা-শায়িত ভৃত্যের নিকট উপস্থিত হয়েন, ভৃত্য নাড়ী দেখা-ইতে হস্ত প্রসারণ করে, চিকিৎসক নাড়ী স্পর্শ করিয়াই বলিয়া উঠেন, "ইহা গৃহ-স্বামীর হাত নহে, কোন গণ্ডমূর্খ চাকরের হাত।" এই অন্ধ চিকিৎসকের নাম কালিদাস গুপ্ত। ইনি চিকিৎসা ব্যবসায়ে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া করিয়াছিলেন। সম্বাদ পত্রে জানা যায়, সম্প্রতি ইউরোপ ভূখণ্ডে একখানি সম্বাদপত্র প্রচারিত হইতেছে। ইহার সম্পা-দক, লেখক ও বর্ণ-সংযোজক (কম্পোজিটর) সকলেই অন্ধ।

উল্লিখিত উদাহরণ-পরম্পরা দ্বারা অন্ধদিগের ক্ষমতা অনেকাংশে উপলব্ধ হইবে, এবং তাহারা মনোযোগ করি-লেই যে স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী সংস্থান করিতে পারে, তাহাও অনুমিত হইবে। কিন্তু পূর্ব্বে যে কতিপয় মহামনস্বীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসদৃশ ব্যক্তি হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা বহুকাল-সাক্ষেপ। বিশেষতঃ অন্ধগণ দেশকালানুসারে কেবল অধ্যাপনা করিয়াই যে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, এরূপ আশা করাও নিতান্ত অসাময়িক ও অসঙ্গত। অন্ধদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের সংস্থান করিয়া দিতে হইলে নিম্নলিখিত কতিপয় উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য :—

১ম। অন্ধনিবাস স্থাপন।

২য়। উক্ত নিবাসে অন্ধদিগের শিক্ষানুকূল নিয়ম সংস্থাপন ও তাহাদিগকে যথারীতি শিক্ষা প্রদান।

৩য়। নিবাসবাসী অন্ধদিগের শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যসমূহ বিক্রয় করিয়া তদুৎপন্ন অর্থদ্বারা নিবাস রক্ষার মূলধন বৃদ্ধি করণ।

৪র্থ। শিক্ষার পরিচয় গ্রহণ ও পুরস্কার স্বরূপ উপযুক্ত অন্ধদিগের সংসার-প্রবেশোপযোগী উপায় সংস্থাপন।

৫ম। সুশিক্ষিত অন্ধদিগের স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য নিবাস-শিক্ষিত বিষয়ানুসারে যথারীতি ব্যবসায় অবলম্বন।

অন্ধনিবাস স্থাপন ও তথায় যথারীতি শিক্ষা প্রদান প্রভৃতি কতিপয় বিষয়ের সহিত অন্ধদিগের জীবন-যাত্রার সংস্থান অনুস্যূত রহিয়াছে। অতএব আদৌ অন্ধনিবাসের বিষয় বিবৃত করিয়া পশ্চাৎ অন্ধদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের বিষয় বিবৃত করা যাইতেছে।

১ম। অন্ধনিবাস স্থাপন।

জীবিকার সংস্থানানুরূপ শিক্ষা লাভ করা নিজায়ত্ত নহে। এতদ্বিষয়ে অপরের হস্তাবলম্বন গ্রহণ করিতে হয়। যাঁহারা স্বশক্তি-সমুত্থিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও কোন না কোন বিষয়ে অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যখন চক্ষুষ্মানগণও অপরের সাহায্য গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছেন, তখন যে অন্ধগণ কেবল নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ

করিতে পারিবে, তাহা নিতান্ত অসম্ভাবিত। অন্ধদিগের স্বাধীন ভাবে জীবিকা-সংস্থান হিতৈষিগণের অভীষ্ট হইলে শিক্ষনীয় অবস্থা হইতেই তাহাদিগের তত্ত্বাবধারণের ভার নিজহস্তে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যানুসারে কাজ করিতে হইলে স্থানবিশেষে এক একটী অন্ধনিবাস স্থাপন করা একান্ত বিধেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। এই অন্ধনিবাস যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্ধদিগের অবস্থান ও আহারাদি বিষয়ের তত্ত্বাবধারণার্থ এক একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। এই অধ্যক্ষ যথানিয়মে সমুদয় অন্ধের অবস্থান প্রভৃতির সুবিধা করিয়া দিবেন। ফলতঃ অন্ধদিগের অবস্থানাদি সম্বন্ধে যাহা কিছু আবশ্যক, তৎসমুদয়ের সম্পাদন বিষয়েই ইঁহাকে দায়িত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

সমুদয় জাতির অন্ধদিগকে এক আশ্রমে স্থান দিলে জাতি অনুসারে তাহাদিগের অবস্থান ও খাদ্য প্রভৃতির সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত। নিবাসে অন্ধ গ্রহণ করিবার সময়েও যথাবিহিত নিয়ম অবলম্বন করা বিধেয়। সংক্রামক রোগাক্রান্তদিগকে নিবাসে স্থান দেওয়া উচিত নহে। যে জাতীয় অন্ধ আশ্রমে বাস-প্রার্থী হইবে, তাহাকে সেই জাতির আবাস-গৃহে স্থান দিয়া তত্ত্বাবধারণ করা কর্ত্তব্য।

অন্ধনিবাস স্থাপন করিবার পূর্ব্বে তদ্রক্ষণোপযোগী একটী মূলধন স্থাপন করা বিধেয়। উক্ত মূলধন-সঞ্চিত মুদ্রাদ্বারাই নিবাসের আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। মূল-ধন-রক্ষার ভার নিবাস-সম্পর্কীয় কতিপয় হিতৈষী ব্যক্তির

হস্তে ন্যস্ত হওয়া উচিত। উক্ত মহোদয়গণ সাক্ষাৎসম্বন্ধে নিবাস রক্ষণোপযোগী মূলধন বৃদ্ধিকরণ ও তদুৎপন্ন অর্থদ্বারা নিবাসের আবশ্যক ব্যয় সম্পাদন, স্বকর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করিবেন।

এডেনবরা ও পারীনগরীতে এক একটী অন্ধনিবাস সংস্থাপিত হইয়াছে; এই দৃষ্টান্তানুসারে আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক নগরেও আর একটী অন্ধনিবাস সংস্থাপিত হয়। শেষোক্ত নিবাসটী ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে মানবকুল-হিতৈষী জন্ ফিসার কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া সমূহ সুফল প্রসব করিতেছে। অতএব অস্মদ্দেশেও এইরূপ এক একটী অন্ধনিবাস সংস্থাপিত হইলে হইলে বহুল উপকার সাধিত হইতে পারে। এতদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা বিধেয় নহে। স্বদেশ-হিতৈষিগণের স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সমীহিত সাধনে অগ্রসর হওয়া উচিত।

২য়। উক্ত অন্ধনিবাসে অন্ধদিগের শিক্ষানুকুল নিয়ম সংস্থাপন ও তাহাদিগকে যথারীতি শিক্ষা প্রদান।

অন্ধনিবাস সংস্থাপন ও নিবাসবাসী অন্ধদিগের অবস্থানের সুবিধা করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকা বিধেয় নহে। যাহাতে অন্ধদিগের ভবিষৎ উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে, তাহার উপায় বিধান করাও একান্ত কর্ত্তব্য। অন্ধদিগকে অবস্থা-সঙ্গত ও ব্যবসায়ানুকুল শিক্ষা দান করিয়া সংসারোপযোগী করাই তথাবিধ উন্নতির প্রশস্ততম উপায়। বিশেষতঃ অন্ধদিগকে যথানিয়মে শিক্ষা দিয়া সংসারোপযোগী করিয়া দেওয়াই অন্ধনিবাস স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

অতএব সর্ব্বদা অবহিত-চিত্ত হইয়া তাহাদিগকে যথানিয়মে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। নিম্নলিখিত বিষয় গুলি অন্ধ-নিবাসে শিক্ষা দিলে অপেক্ষাকৃত সুফল পাওয়া যাইতে পারে :—

সঙ্গীত বিদ্যা, সুচিকার্য্য, রজ্জু ও দ্রব্যাধার (চাঙ্গাড়ি ইত্যাদি) প্রভৃতির নির্ম্মাণ, লিখন ও পঠন।

উল্লিখিত বিষয় গুলির শিক্ষা দানার্থ সময় বিভাগ করিয়া দেওয়া উচিত। বিভিন্ন বিষয়ের কতিপয় শিক্ষক যথাসময়ে অন্ধদিগকে নির্দ্দিষ্ট বিষয় গুলি শিক্ষা দিবেন। এইরূপ শিক্ষা দিতে কতিপয় শিক্ষানুকূল নিয়ম সংস্থাপনের আবশ্যকতা উপস্থিত হইবে। প্রস্তাবিত বিষয়ে নিম্ন লিখিত কতিপয় নিয়মই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত বলিয়া বোধহয়।

নিবাস-সন্নিধানে কি নিবাস-মধ্যে একটী সুপ্রশস্ত গৃহে অন্ধ-শিক্ষালয় স্থাপন করা উচিত। প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ন ১০ টা হইতে পরাহ্ন ৩ টা পর্য্যন্ত অন্ধদিগকে যথানিয়মে পূর্ব্বোক্ত বিষয় গুলি শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

অন্ধদিগকে সপ্তাহের মধ্যে এক দিন বিশ্রাম দিয়া চিত্তবিনোদনার্থ অবকাশ-কাল নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিতে দেওয়া উচিত। সঙ্গীতানুশীলন, সকলে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া বিশুদ্ধ উপন্যাস কি অন্যবিধ কোন ইতিহাস শ্রবণ এবং অন্ধোপযোগী পদ্ধতি অনুসারে বিবিধ মুদ্রিত পুস্তক অধ্যয়নই এই চিত্তবিনোদনের প্রশস্ত উপায়। শারীরিক স্বাস্থ্য সম্পাদনার্থ অবস্থানুরূপ ব্যায়ামাদি করিতে দেওয়াও অপরামর্শ-সিদ্ধ নহে। শিক্ষনীয় বিষয়ানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বিভাগ করিয়া তদনুসারে

যথা সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্ধদিগের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি পূর্ব্ব-প্রদর্শিত বিষয় গুলির যে কোন বিষয় শিক্ষা করিতে অভিলাষ করে, তাহাকে তত্তৎ বিষয়ের শিক্ষাধীন করা কর্ত্তব্য। অথবা যে ব্যক্তি যে বিষয় গুলিতে স্বল্প সময়ের মধ্যে সুশিক্ষিত হইতে পারে, তাহাকে সেই বিষয় শিক্ষা দেওয়াই প্রশস্ত। অপেক্ষাকৃত উন্নত ক্ষমতাশালী অন্ধদিগকে একবারে তিন চারিটী বিষয়ের শিক্ষাধীন করাও অবিবেচনা-সিদ্ধ নহে।

অন্ধ-নিবাসে শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে পাঠোপযোগী পুস্তক সমূহ অন্ধদিগের অবস্থা-সঙ্গত করিয়া মুদ্রিত করা আবশ্যক। এতদ্বিষয়ে সবিশেষ কৌশল প্রদর্শনের আবশ্যকতা উপস্থিত হইবে। কাষ্ঠফলকে অক্ষর সমূহ খুদিয়া অন্ধদিগকে বর্ণপরিচয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদিগের অধ্যয়নানুকূল পুস্তক সমুহ মুদ্রিত না করিলে বর্ণ শিক্ষা নিতান্ত বিফল হইয়া উঠিবে। ঈদৃশ পুস্তক মুদ্রিত করিতে অনুকৃতি দর্শন অপেক্ষা কল্পনা ও চিন্তাশক্তি পরিচালনের সমধিক প্রয়োজন। নিম্ন লিখিত ত্রিবিধ প্রণালী অনুসারে অন্ধদিগের পাঠোপযোগী পুস্তক সমূহের মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সম্পাদন করা যাইতে পারে :—

১। বর্ত্তমান সংক্ষিপ্ত লিখন-প্রণালী অনুসারে কোন মুদ্রাপদ্ধতি বিশেষ অবলম্বন।

এই প্রণালী-বিশেষ আশ্রয় করিয়া অন্ধদিগের পাঠোপযোগী পুস্তক সমুহ মুদ্রিত করিতে হইলে বিশিষ্ট কৌশল ও কল্পনা শক্তি পরিচালনের আবশ্যকতা উপস্থিত হইবে।

অতএব যথোচিত উদ্ভাবনী শক্তি প্রকাশ করিয়া এক একটী পদ-প্রকাশক ও এক একটী অক্ষর প্রস্তুত করা আবশ্যক। অক্ষর গুলি এরূপ কৌশল সহকারে নির্ম্মাণ করা উচিত যে, কাগজের এক পৃষ্ঠায় দৃঢ়তর বল প্রয়োগ করিয়া মুদ্রিত করিলে অপর পৃষ্ঠা-স্ফুটিত অক্ষর গুলি বিপর্য্যস্ত না হইয়া স্বাভাবিক অবস্থাপন্ন হয়। এইরূপ সুকৌশল-নির্ম্মিত অক্ষর সমূহ বিনা কালীতে মোটা কাগজের এক পৃষ্ঠায় এরূপ শক্তি প্রয়োগ করিয়া মুদ্রিত করা আবশ্যক যে, অপর পৃষ্ঠায় সেই অক্ষর সমূহ বিলক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া হস্ত-পরামর্শ-বোধ্য হইতে পারে। দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে এই প্রণালীটীই অন্ধদিগের বিশিষ্ট অবস্থানুকূল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এরূপ করিলে অন্ধদিগের সর্ব্বদা আকার-ইকার, বিন্দু, বিসর্গ প্রভৃতির অন্বেষণ-জনিত কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। তাহারা কেবল হস্ত-পরামর্শ দ্বারা প্রয়োজনীয় পুস্তক সমূহের মর্ম্ম অবগত হইয়া অনির্ব্বচনীয় মানসিক প্রীতি অনুভব করিতে সমর্থ হইবে।

২। প্রথম প্রণালী-প্রদর্শিত মুদ্রাপদ্ধতি অনুসারে প্রচলিত অক্ষর সমূহ মুদ্রিত করা।

প্রথম পদ্ধতি অনুসারে প্রচলিত বড় বড় অক্ষর সমূহ মোটা কাগজের এক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিলেও কাজ চলিতে পারে। অন্ধগণ এ গুলিও পূর্ব্বের ন্যায় হস্ত-পরামর্শ দ্বারা বুঝিয়া লইতে পারিবে।

৩। মোটা কাগজের এক পৃষ্ঠায় বিলক্ষণ গাঢ়মসী দ্বারা বড় বড় অক্ষর সমূহের মুদ্রণ।

এই পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা মুদ্রামসী এরূপ গাঢ় করিতে হইবে যে, মুদ্রিত অক্ষর গুলি স্বাভাবিক অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া হস্ত পরামর্শানুকুল হইতে পারে। এই প্রণালী দ্বারাও অন্ধদিগের অনল্প উপকারের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। প্রস্তাবের প্রারম্ভে অন্ধগণের স্পর্শ শক্তির উৎকর্ষের বিষয় যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই ইহার আবশ্যকতা উপলব্ধ হইবে।

ইউরোপের অন্ধনিবাসে উল্লিখিত উপায়ত্রয়ের অন্যতম পদ্ধতি দ্বারা ব্যাকরণ, ধর্ম্ম বিষয়ক প্রস্তাব, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া অন্ধদিগের বিশিষ্ট উপকার সাধন করিতেছে। শেষোক্ত প্রণালীদ্বয় অনুসারে মুদ্রিত পুস্তকগুলি খণ্ডশঃ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। অন্যথা পুস্তকের পত্র সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়িবে। ইউ-রোপের কোন অন্ধনিবাসে বাইবলের একটী অধ্যায় উক্ত নিয়মানুসারে মুদ্রিত হইয়া তিন খণ্ডে পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মুদ্রিত পুস্তক সমূহ আশানুরূপ ফল সাধন করিতে পারিবে না, এরূপ মনে করা নিতান্ত অযৌক্তিক। অন্ধদিগের স্পর্শ জ্ঞানের প্রখরতা যাঁহারা ধারণা করিতে না পারেন, তাঁহারাই এই রূপ অসঙ্গত মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার প্রেস্কট লিখিয়াছেন, তাঁহার একজন পরিচিত অন্ধ সঙ্গীত শাস্ত্রের স্বরলিপির কোন্ স্থানে অধিক কালী এবং কোন্ স্থান অল্প কালী দ্বারা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা কেবল হস্ত

পরামর্শ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিতেন। ঈদৃশ প্রখর স্পর্শ-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যে হস্ত-পরামর্শ-বলে পূর্ব্ব-প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে মুদ্রিত পুস্তক সমূহ অধ্যয়ন করিতে পারিবে না, এরূপ মত প্রকাশ করা যে কতদূর সাধু যুক্তির অনুমোদিত, তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গই, অনুভব করিবেন।

সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি হস্ত-পরামর্শ-বলে শিক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু গণিত শিক্ষা তথাবিধ অনায়াস-সাধ্য নহে। ইহা শিক্ষা করিতে হইলে অন্ধদিগকে মানসিক শক্তির বিশিষ্ট পরিচালনা করিতে হইবে। আদৌ অন্ধ-নিবাসে লিখন-কার্য্য শিক্ষা দেওয়া বিধেয়। কাগজে পিন দ্বারা বর্ণ-সমূহের অঙ্কন-প্রণালী শিখাইলেই অন্ধদিগের লেখার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারিবে। ইহাতে কেবল অন্ধগণ নহে, চক্ষুষ্মান্ গণও লেখা গুলি বুঝিতে পারিবেন। প্রেস্কটের পরিচিতা একটী অন্ধ মহিলা বিশিষ্ট সত্বরতা সহকারে পিন দ্বারা কাগজ স্ফুটিত করিয়া পত্রাদি লিখিতেন। অপর অন্ধগণ উক্ত কাগজে হস্ত পরামর্শ করিয়া লিখিত বিষয় অনায়াসে বুঝিত। চক্ষুষ্মান্ গণও আলোর নিকট উহা ধরিয়া লেখাগুলি সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেন। যাহা হউক; এইরূপ উপায় দ্বারা লিখন-প্রণালী অভ্যস্ত হইলে গণিত শিক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য হইয়া উঠিবে।

সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করিতে অন্ধদিগকে বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না। সঙ্গীত শাস্ত্রের স্বরলিপি সমূহ পূর্ব্ব প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে মুদ্রিত করা কর্ত্তব্য।

জীবন কার্য্য এবং নানাবিধ দ্রব্য নির্ম্মাণ শিক্ষা দিবার সময় অন্ধগণের সমক্ষে তত্তৎ বিষয়ের এক একটী আদর্শ স্থাপন করা কর্ত্তব্য, অন্ধগণ হস্ত দ্বারা তাহার স্বরূপ অবগত হইলে বাচনিক উপদেশ প্রভৃতি দ্বারা কার্য্য-প্রণালী শিক্ষা দেওয়া উচিত।

অনেকে মনে করিতে পারেন, অন্ধদিগের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করা বিড়ম্বনা মাত্র। এতদ্দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফল-লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের এই মত নিতান্ত ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত। অন্ধদিগের গুণের বিষয় পূর্ব্বে যেরূপ বিবৃত হইয়াছে তদ্দ্বারাই অন্ধশিক্ষালয় স্থাপনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইবে। অন্ধদিগের বিবিধ গুণসম্ভাব-নিবন্ধন দেশ-হিতৈষী হাউই সাহেব ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পারী নগরীতে একটী অবৈতনিক অন্ধশিক্ষালয় স্থাপন করেন। এই শিক্ষালয়টী প্রসিদ্ধ ফরাসী বিপ্লব পর্য্যন্ত তাদৃশ সুফল প্রসব করে নাই। কিন্তু পরিশেষে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ডাক্তার পিনিএর অধীন হইয়া আশানুরূপ ফলপ্রদ হইয়াছে। পারী নগরীর দৃষ্টান্ত ইংলণ্ড, স্কট্‌লাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, রুষিয়া ও সুইট্‌জর্লাণ্ড প্রভৃতি দেশ সমূহের প্রধান প্রধান নগরে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সমুদয় অন্ধনিবাসের শিক্ষা যে ব্যর্থীভূত হইতেছে, এরূপ নহে। প্রত্যুত উহা অন্ধদিগের মঙ্গলই সাধন করিতেছে। অতএব অন্ধ নিবাসের শিক্ষা দ্বারা তাদৃশ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই, এরূপ বাক্য বিন্যাস করা নিরবচ্ছিন্ন প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন মাত্র।

৩য়। নিবাস-বাসী অন্ধদিগের শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য

সমূহ বিক্রয় করিয়া তদুৎপন্ন অর্থ দ্বারা নিবাস-রক্ষার মূলধন বৃদ্ধি করুণ।

অন্ধনিবাস অন্ধদিগের স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান অবলম্বন। ইহার আশ্রয়-গ্রাহী না হইলে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া জীবিকা সংস্থান করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। ফলতঃ অন্ধনিবাস দ্বারা অন্ধদিগের যে কতদূর উপকার সাধিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সাধুশীল পিতা যেমন স্বীয় সন্তানদিগকে যথারীতি শিক্ষা দিয়া সংসারোপযোগী করিতে সচেষ্ট থাকেন, অন্ধ-নিবাসও অন্ধদিগকে তাদৃশ অবস্থান্বিত করিতে সবিশেষ প্রয়াসবান্ হইয়া থাকে। ঈদৃশ হিতকর নিবাসের মূল-ভিত্তি দৃঢ়ীভূত করা সর্ব্বথা শ্রেয়স্কর। নিবাস-রক্ষণোপ-যোগী মূলধন সঞ্চয় করাই এই ভিত্তি দৃঢ় করিবার প্রশস্ত উপায়। প্রস্তাবের প্রারম্ভে মূলধন সঞ্চয়ের প্রসঙ্গ করা গিয়াছে। পুনর্ব্বার তদ্বিষয়ের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলে অনেকে এইপ্রস্তাবটী দ্বিরুক্তি দোষ-দুষ্ট মনে করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা অবহিত-চিত্তে তৃতীয় উপায়টীর মর্ম্মগ্রাহী হইলেই আরোপিত দোষ নিতান্ত অলীক বলিয়া বোধ করিবেন, সন্দেহ নাই।

অন্ধনিবাসে শিল্প-শিক্ষাপ্রণালী যথারীতি প্রবর্ত্তিত হইলে অন্ধগণ কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে বিবিধ শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইবে। এই সমুদয় দ্রব্য সঞ্চিত করিয়া রাখিলে তাদৃশ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। অন্ধদিগের শিল্পোৎ-পন্ন দ্রব্য সমূহ প্রদর্শনের জন্য সঞ্চয় করা উচিত; অনেকে

এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু এবম্বিধ প্রদর্শনের সহিত কোন ফল-সংযোগ নাই। এই শিল্প-জাত দ্রব্য সমূহ প্রদর্শন জন্য একটী গৃহে সুসজ্জিত করিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে একবারে প্রদর্শন ও অর্থলাভ দুইই হইতে পারে। বিক্রয়-লব্ধ এই অর্থ, নিবাস রক্ষার মূলধনের সহিত যোগ করাই সাধু যুক্তির অনুমোদিত বলিয়া বোধ হয়। এতদ্দ্বারা যে মূলধনের বৃদ্ধি বিষয়ে কিছু উপকার সাধিত হইবে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই। অন্ধনিবাস অন্ধদিগের অদ্বিতীয় অবলম্বন স্বরূপ, অতএব তাহাদিগের পরিশ্রমজাত যৎকিঞ্চিৎ বিষয় ইহার উপকারার্থ ব্যয়িত হওয়া অপরামর্শ-সিদ্ধ নহে। কেহ কেহ অন্ধদিগের শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়লব্ধ অর্থদ্বারা তাহাদিগের জীবিকা রক্ষণোপযোগী সংস্থান করিবার উপদেশ দিতে পারেন। কিন্তু ইহা শিক্ষনীয় অবস্থাপন্ন অন্ধদিগের পক্ষে সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। কি রূপে আশানুরূপ সুশিক্ষিত অন্ধদিগের জীবিকা সংস্থানের সূত্রপাত হইবে, পরবর্ত্তী উপায়ে তাহা যথারীতি বিবৃত হইতেছে।

৪র্থ। শিক্ষার পরিচয় গ্রহণ ও পুরস্কার স্বরূপ আশানু-রূপ সুশিক্ষিত অন্ধদিগের জন্য সংসার প্রবেশোপযোগি সংস্থান করণ।

যিনি যে বিষয় শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হউন না কেন, এক এক সময়ে তাহার পরিচয় গ্রহণ করিলে যথেষ্ট ফল লব্ধ হয়। অপরীক্ষিত শিক্ষা জীবিকা-সংস্থান বিষয়ে তাদৃশ ফলোপধায়িনী নহে। অতএব অন্ধশিক্ষালয়ে পরীক্ষা-প্রণালী

প্রবর্ত্তিত করা অতীব আবশ্যক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। আদৌ অন্ধগণ যে বিষয় শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই বিষয়ে আশানুরূপ সুশিক্ষিত ও জীবিকা-নির্ব্বাহ-ক্ষম হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষা করিলেই যথেষ্ট হইবে। যাহারা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে, পুরস্কার স্বরূপ তাহাদিগকে সংসারোপযোগি সংস্থান করিয়া দেওয়া উচিত।

সংসারে প্রথম-প্রবিষ্ট হইয়া কিছু অবলম্বন না পাইলে দিশাহারা হইতে হয়। অন্ধগণ সেই সময়ে সাহায্য না পাইলে কিরূপ দুর্দ্দশান্বিত হইবে, তাহা সহৃদয়গণ চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। হয় ত অবশ্যম্ভাবী দুর্দ্দশাই তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পথের ভিখারী করিয়া তুলিবে। স্বশক্তি-সমুত্থিত হওয়া বহুকাল-সাপেক্ষ। বিশেষতঃ অন্ধ-দিগের মধ্যে তথাবিধ উন্নতি প্রায়ই দুর্লভ। অতএব যে সকল অন্ধ সুশিক্ষিত বলিয়া বিচিত হইবে, শিক্ষিত বিষয়ানুসারে তাহাদিগের জীবিকার উপায় করিয়া দেওয়া নিবাসের অধ্যক্ষগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্ধগণ ঐ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পরিশেষে স্বীয় ক্ষমতানুসারে সমুত্থিত হইতে পারিবে।

বর্ত্তমান প্রস্তাবে ঈদৃশ কোন নির্দ্দিষ্ট উপায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে না। ইহার নির্দ্দেশ ভার অন্ধনিবাসের কর্ত্তৃপক্ষগণের উপরেই সমর্পিত হইতেছে। তাঁহারাই বিবে-চনা করিয়া শিক্ষিত বিষয়ানুসারে অন্ধদিগের জন্য কোন রূপ সংস্থান করিয়া দিবেন। সাহায্য-শূন্য ও দরিদ্র-ভাবাপন্ন

অন্ধদিগের নিমিত্তই যে এই উপায়টী অবলম্বিত হইবে, তাহার উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। যাহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থাপন্ন, তাহাদিগকে উক্তরূপ সংস্থান না করিয়া দিলেও চলিতে পারে।

৫ম। সুশিক্ষিত অন্ধদিগের নিবাস-শিক্ষিত বিষয়ানুসারে যথারীতি ব্যবসায় অবলম্বন।

এই পঞ্চম ও শেষ উপায়টী প্রকৃষ্টপদ্ধতি ক্রমে কার্য্যে পরিণত হইলে, অন্ধদিগকে আর উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতে হইবে না। অন্ধগণ শিক্ষালয়ে যে বিষয়ে সুশিক্ষিত হইবে, সংস্থানানুরূপ সেই বিষয় অবলম্বন করিয়াই আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইতে পারে। পরন্তু অন্ধগণ যদি সুশিক্ষিত হইয়া ব্যবসায় বিশেষের পরিচালনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহারা পরমুখপ্রেক্ষী না হইয়া আপনাদিগের পোষ্যবর্গেরও ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

অনেকে বলিয়া থাকেন, গ্রীষ্মকালে পাখাটানা অন্ধদিগের জীবনোপায়ের একটী উৎকৃষ্ট উপায়। একবার সম্বাদ পত্র বিশেষেও ইহার আন্দোলন হইয়াছিল। কিন্তু পাখাটানা-কার্য্য ইতর শ্রেণীর অন্ধদিগের করণীয়। ভদ্র শ্রেণীর অন্ধগণ এরূপ কার্য্যে কখনও নিয়োজিত হইতে সম্মত হইবেন না। বিশেষতঃ সকল সময়ে পাখাটানার আবশ্যকতা উপস্থিত হয় না, কেবল গ্রীষ্মকালেই ইহার প্রয়োজন পড়ে। এরূপ ক্ষণস্থায়ি কার্য্যের জন্য ঊর্দ্ধনেত্র না হইয়া পূর্ব্ব প্রদর্শিত উপায়ানুসারে অন্ধদিগের জীবিকা

নির্ব্বাহ করাই সৎপরামর্শ-সিদ্ধ। তবে প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, ইতরশ্রেণীর অন্ধগণ এই কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে।

প্রতাপ সিংহ।

রাজপুতনার হলদিঘাট অতীত-সাক্ষী ইতিহাসের অতি আদরের ধন, হলদিঘাটের বীরত্ব রসলীলাময়ী কবিতা-দেবীর অতি প্রিয়তর বিষয়। যোড়শ শতাব্দীতে ভারতের নির্ব্বাণোন্মুখ বীর্য্য-বহ্নির একটী স্ফুলিঙ্গ এই হলদিঘাটে দুর্ব্বার-পরাক্রম রাজপুত জাতির হৃদয়-চুল্লী হইতে উত্থিত হইয়া অসামান্য অনল-ক্রীড়া প্রদর্শন করে। গ্রীস যে থর্ম্মাপোলির জন্য আজ পর্য্যন্ত বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় হইয়া রহিয়াছে, সেই থর্ম্মাপোলির সহিত ভারতের হলদিঘাট এক শ্রেণীতে নিবেশিত হইবার উপযুক্ত। থর্ম্মাপোলির অধিনায়ক লিওনিদসের ন্যায় হলদিঘাটের অধিনায়ক প্রতাপ সিংহও অনন্তকাল স্বর্গস্থ দেব-সমিতিতে অপ্সরোদিগের বীণানিন্দিত মধুর স্বরে স্তুত হইবার যোগ্য, লিওনিদস যেরূপ থর্ম্মাপোলিতে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য অলোক-সামান্য পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন, প্রতাপ সিংহও

সেইরূপ হলদিঘাটে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য শৌর্য্য বীর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। উভয় গিরি-সঙ্কটই উভয় যোদ্ধার জন্য ইতিহাসে পরম পবিত্র পুণ্য ভুমি বলিয়া বিঘোষিত হইতেছে, উভয় দেশই উভয় যোদ্ধার জন্য পৃথিবীতে বীর-লীলাক্ষেত্র বলিয়া সম্মানিত ও সমাদৃত হইতেছে।

এই সুযোদ্ধা, স্বদেশ-হিতৈষী ও স্বকর্ত্তব্য-পরায়ণ প্রতাপ সিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, দুরন্ত যবন-গ্রাস হইতে মাতৃ-ভূমির উদ্ধার সাধনার্থ যে সমস্ত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, রাজস্থানের ইতিহাসে অনন্তকাল তাহা স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। শতাব্দের পর শতাব্দ অতীত হইয়াছে, অদ্যাপি রাজস্থানের লোকের স্মৃতিতে এই সমস্ত বিররণ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্ব পুরুষের এই বৃত্তান্ত বলিবার সময় রাজপুতের হৃদয়ে অভুতপূর্ব্ব তেজের আবির্ভাব হয়, ধমনী-মধ্যে রক্তের গতি প্রবল হয়, এবং নয়ন-জলে গণ্ডদেশ প্লাবিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রতাপ সিংহের কার্য্য-পরম্পরা রাজস্থানের অদ্বিতীয় গৌরব ও অদ্বিতীয় মহত্ত্বের বিষয়। কোনও ব্যক্তি রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ও সর্ব্ব প্রকার সৌভাগ্য-সম্পত্তির ক্রোড়ে লালিত হইয়া প্রতাপের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হয়েন নাই, কোনও ব্যক্তি স্বদেশ-হিতৈষণায় উদ্দীপ্ত হইয়া স্বাধীনতা রক্ষার্থ বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া প্রতাপের ন্যায় কষ্টভোগ করেন, নাই। অর্ব্বলী পর্ব্বত-মালার সমস্ত দরী, সমস্ত উপত্যকাই প্রতাপ সিংহের গৌরব-স্তম্ভে উদ্ভাসিত রহিয়াছে। অনন্তকাল এই গৌরব-স্তম্ভ উন্নত থাকিয়া রাজস্থানের মহিমা প্রকাশ

করিবে। ভারত-মহাসাগরের সমগ্র বারিতেও ইহা নিমগ্ন হইবে না, হিমালয়ের সমগ্র অভ্রংলিহ শৃঙ্গপাতেও ইহা বিচূর্ণ হইবে না।

প্রতাপ সিংহ মিবারের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। মিবারের রাজবংশীয়দিগের সাধারণ উপাধি "রাণা"। রাণাগণ সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত। ইঁহারা বলিয়া থাকেন, রামচন্দ্রের পুত্র লব, ইঁহাদের বংশের আদি পুরুষ। লব পঞ্জাবে লবকোট (আধুনিক লাহোর) নামে একটী নগর স্থাপন করেন। এই লবকোট বা লাহোরই রাণা-দিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের আদি আবাস-স্থল। লবের বংশ-ধরগণ বহুকাল লাহোরে অবস্থান করেন, পরে ইঁহাদের অধিনেতা কণকসেন ১৫৪ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর হইতে দ্বারকায় যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ১৪৪ অব্দে কণকসেন কর্ত্তৃক বীরনগর নামে একটী নগর সংস্থাপিত হয়। কণক-সেনের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ বিজয়সেন, বিজয়পুর নামে আর একটী নগর স্থাপন করেন। বর্ত্তমান ধোল্কা এক্ষণে যে স্থলে আছে, অনেকে অনুমান করেন, বিজয়পুর সেই স্থলে অবস্থিত ছিল। বিজয়সেন, বিজয়পুর ব্যতীত বিদর্ভ নামে আরও একটী নগরের প্রতিষ্ঠাতা, বিদর্ভের পরিবর্ত্তে পরিশেষে এই নগরের নাম সিহোর হয়। যাহা হউক, বল্লভীপুরেই ইঁহাদের রাজধানী ছিল। কাল ক্রমে অসভ্য জাতির আক্রমণে বল্লভীপুর বিনষ্ট হইলে অধিবাসিগণ ইতস্ততঃ পলায়িত হয়। বল্লভীপুর-রাজ এই বিপ্লবে বিনষ্ট হয়েন, রাণীগণ ভর্ত্তার সহিত চিতানলে আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন

করেন। কেবল অন্যতম রাণী পুষ্পবতী ঘটনাক্রমে স্থানান্তরে ছিলেন বলিয়া এই ভীষণ বিপ্লবের হস্ত হইতে রক্ষা পান। জৈনদিগের গ্রন্থানুসারে এই বিপ্লব ৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

বল্লভীপুর-ধ্বংসের সময় পুষ্পবতী গর্ভবতী ছিলেন। বল্লভীপুরের শোচনীয় সম্বাদ তাঁহার নিকট পঁহুছিলে, তিনি একটী পর্ব্বত-গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই গুহায় তাঁহার একটী পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। পুষ্পবতী কমলাবতী নাম্নী একটী ব্রাহ্মণ-পত্নীর হস্তে তনয়ের রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া ভর্ত্তার উদ্দেশে চিতাধিরোহণ করেন। গুহায় জন্মিয়াছে বলিয়া পুষ্পবতী-তনয় গুহ নামে অভিহিত হয়েন। কালক্রমে গুহ পার্ব্বত্য প্রদেশের ভিলদিগের অধিনায়ক হইয়া উঠেন। এই গুহ হইতে "গোহিলোট্" (সাধারণতঃ "গেলোট") শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

গুহের সন্তানগণ অষ্টম পুরুষ পর্য্যন্ত এই পার্ব্বত্য প্রদেশে আধিপত্য করেন। অষ্টম ভূপতির নাম নগদিত। একদা অসভ্য ভিলগণ বিদেশীয় রাজার শাসনে উত্ত্যক্ত হইয়া নগদিতের প্রাণ সংহার করে। নগদিতের বাপ্পা নামে তিন বৎসর-বয়স্ক একটি পুত্র সন্তান ছিল। জনৈক ভিল দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে ভাণ্ডিয়ার দুর্গে আনিয়া রক্ষা করে। ভাণ্ডিয়ার হইতে বাপ্পা অধিকতর নিরাপদ স্থল পারাশর অরণ্যে আনীত হয়েন। এই অরণ্যের নিকটেই ত্রিকূট পর্ব্বত শিরঃ উত্তোলন করিয়া বিরাট পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পর্ব্বতের পাদ-

দেশে নগেন্দ্র নগর অবস্থিত। নগেন্দ্র নগর ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণগণ এই স্থলে বেদ-গানে ও বেদোচিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেন। এই পর্ব্বত-পাদ-দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আশ্রয়-ক্ষেত্রে বাপ্পার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়।

এই সময়ে চিতোর রাজ্য প্রমরাবংশীয় মোরী ভূপতিদিগের শাসনাধীন ছিল। গুহের গর্ভধারিণী পুষ্পবতী প্রমরাবংশীয় চন্দ্রবতী-রাজের দুহিতা। এই গুহের বংশে বাপ্পা রাওর জন্ম, সুতরাং বাপ্পার সহিত প্রমরা-বংশের সম্বন্ধ ছিল। এই সম্বন্ধের বিষয় অবগত হইয়া বাপ্পা চিতোরে উপস্থিত হয়েন। চিতোরের তদানীন্তন নৃপতি বাপ্পাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাপ্পা এইরূপে চিতোরের সেনাপতি হইয়া কিছুকাল যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। যুদ্ধে তাঁহার অসাধারণ বিক্রম প্রকাশিত হয়। কালক্রমে নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট কারণ-বশে মোরী কুলের পতন হয়; বাপ্পা ৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে চিতোরের সিংহাসন গ্রহণ করেন। কথিত আছে, যখন বাপ্পা রাও চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র হইয়াছিল।

এই বাপ্পা রাও চিতোরের গোহিলোট্ বংশের সংস্থাপয়িতা, এই বাপ্পা রাও "হিন্দুকুল সূর্য্য" বলিয়া রাজস্থানে সম্মানিত; চিতোর-ভূমি যে অদ্যাপি বীরকুলধাত্রী ও বীরকুলপ্রসবিনী বলিয়া সহৃদয় ঐতিহাসিক ও সহৃদয় কবির হৃদয়গত শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইয়া আসিতেছে;

এই বাপ্পা রাওই তাহার মুল। বাপ্পা রাওর বংশধরগণ অনেকবার যবনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন, অনেক বার যবনদিগকে পরাস্ত করিয়া রাজপুত নামের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন পানীপথ-ক্ষেত্রে লোদিবংশের পতন ও মোগল বংশের অভ্যুদয় হয়, তখন বাপ্পা রাওর বংশধরগণ মিবারে সবিশেষ পরাক্রমশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই প্রসিদ্ধ বংশে রাণা সঙ্গের ঔরসে উদয় সিংহের জন্ম হয়। রাণা সঙ্গ পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া যাইতে পারেন নাই; উদয় সিংহের ভুমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বেই ঘোর চক্রান্ত-জালে তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হয়। যাহা হউক, উদয়সিংহের বয়স যখন ছয় বৎসর, তখন চিতোরের অন্তর্বিপ্লবে তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে। উদয় সিংহ স্নেহময়ী ধাত্রী ও জনৈক বিশ্বস্ত ক্ষৌরকারের কৌশলে এই অন্তর্বিপ্লবের অধিনায়ক করাল শত্রু বানবীরের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করেন*। রাণা সঙ্গের সন্তানের জন্য রাজপুত-ধাত্রীর

---

* বানবীরের সহিত গোহিলোট বংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না। তিনি অন্যায় করিয়া চিতোরের সিংহাসন অধিকার করেন, এবং রাজত্ব নিরাপদ করিবার জন্য রাণা সঙ্গের পুত্র উদয় সিংহকে বধ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হয়েন। একদা রাত্রিকালে উদয় সিংহ আহার করিয়া নিদ্রিত আছেন, এমন সময় একজন ক্ষৌরকার উদয় সিংহের ধাত্রীকে এই ভয়ানক সম্বাদ জানায়। ধাত্রী তৎক্ষণাৎ একটী ফলের চাঙ্গাড়ির মধ্যে নিদ্রিত উদয় সিংহকে রাখিয়া এবং তাহার উপরিভাগ পত্রাদিতে আচ্ছাদন করিয়া ক্ষৌরকারের হস্তে সমর্পণ করে। বিশ্বস্ত ক্ষৌরকার সেই চাঙ্গাড়ি লইয়া নিরাপদ স্থানে যায়। এমন সময় ঘাতকগণ আসিয়া ধাত্রীর নিকট উদয় সিংহের বিষয় জিজ্ঞাসা করে। ধাত্রী বাঙ্‌নিষ্পত্তি

এই কৌশল জগতের ইতিহাসে দুর্লভ। যে চিতোরের জন্য—হিন্দুকুল-সূর্য্য বাপ্পা রাওর বংশ রক্ষার নিমিত্ত অবলীলাক্রমে অম্লানবদনে বাৎসল্যের শৈশবদোলা, স্নেহের অদ্বিতীয় অবলম্বন, প্রীতির একমাত্র পুত্তলী শিশু সন্তানকে মৃত্যুমুখে সমর্পণ করে, তাহার স্বার্থত্যাগ কতদূর মহান্ ও কতদূর উচ্চভাবের পরিচায়ক! যে স্বদেশের গৌরব রক্ষার্থ হৃদয়রঞ্জন কুসুমকলিকাকে বৃন্ত-চ্যুত দেখিয়াও কর্ত্তব্য-হারা না হয়, তাহার হৃদয় কতদূর তেজস্বিতা ও কতদূর স্বদেশহিতৈষিতার পরিপোষক, প্রকৃত তেজস্বী ও প্রকৃত দেশহিতৈষী ব্যতীত অন্য কেহ এই তেজস্বিনী নারীর হৃদয়-গত মহান্ ভাব বুঝিতে পারিবেন না। ভীরু প্রকৃতি, ধাত্রীকে রাক্ষসী বলিয়া ঘৃণা করিতে পারে, কিন্তু তেজস্বিনী প্রকৃতি তাহাকে মূর্ত্তিমতী হিতৈষিতা বলিয়া অনন্তকাল যত্নের সহিত হৃদয়ে রক্ষা করিবে। বস্তুতঃ ধাত্রীর নিঃস্বার্থ হিতৈষণা তাহার রাক্ষসী-ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সাধারণে এরূপ অসাধারণ ভাব মনেও ধারণা করিতে পারে না। যাবৎ হিতৈষণা ও তেজস্বিতার সম্মান থাকিবে, তাবৎ এই স্বার্থত্যাগ ও তেজস্বিনী পান্নার নাম কখনও ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইবে না।

চিতোর হইতে পলায়নের পর উদয় সিংহ বহুকাল পান্নার

না করিয়া স্বীয় নিদ্রিত পুত্রের প্রতি অঙ্গুলি প্রসারণ করে। ঘাতকগণ উদয় সিংহ বোধে সেই ধাত্রী-পুত্রেরই প্রাণ সংহার পূর্ব্বক প্রস্থান-পর হয়। এদিকে ধাত্রীও স্বীয় পুত্রের প্রেতকৃত্য সম্পন্ন করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে ক্ষৌরকারের সহিত মিলিত হয়। এই ধাত্রীর নাম পান্না।

তত্ত্বাবধানে দেশান্তরে রক্ষিত হয়েন। কালক্রমে মিবারের সর্দ্দারগণ উদয় সিংহকেই চিতোরের বিধিসঙ্গত রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। উদয় সিংহের অনুকুলে মিবারের প্রধান প্রধান লোক সমবেত হইয়া যুদ্ধ উপস্থিত করাতে বানবীর চিতোর পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে যাইতে অনুমত হয়েন, সুতরাং উক্ত রাজ্য উদয় সিংহের করায়ত্ত হয়। এইরূপে মহাপরাক্রান্ত সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বহুকাল দেশান্তরে অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া উদয় সিংহ ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে বাপ্পা রাওর সিংহাসনে সমাসীন হয়েন। রাজ্য প্রাপ্তির কিছু পূর্ব্বে তিনি ঝালোর-রাওর দুহিতার পাণি গ্রহণ করেন, এই দম্পতী-সম্মিলনেই প্রতাপ সিংহের উৎপত্তি হয়।

প্রতাপসিংহ কোন্ সময়ে জন্ম পরিগ্রহ করেন; রাজস্থানের ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। তবে তাঁহার সমকালে রাজস্থানের নিতান্ত শোচনীয় দশা উপস্থিত হয়, মোগলদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণই এই দশাবিপর্য্যয়ের একমাত্র কারণ। এই আক্রমণের সময় ভাবিলে প্রতিপন্ন হইবে, প্রতাপসিংহ ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ভুমিষ্ঠ হয়েন। যাহা হউক, যে সময়ে বাপ্পা রাত্তর টীকা প্রতাপের ললাটদেশ সুশোভিত করে, সে সময়ে বীর-প্রসবিনী চিতোর-ভুমি কিরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

রাজস্থানের প্রসিদ্ধ কবি চাঁদ বর্দ্দে বলিয়াছেন, "যে স্থানে নাবালক রাজত্ব করে, কিম্বা স্ত্রীলোক শাসন-কার্য্য

চালায় সে স্থানকে ধিক্।" যে স্থলে এই উভয়ের সমাবেশ হয়, সে স্থলের দুর্দ্দশার আর ইয়ত্তা থাকে না। চিতোর-রাজ উদয় সিংহ এই নাবালক ও নারী, উভয়েরই প্রকৃতি ও ধর্ম্ম অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ যে তেজস্বিতা ও বীরত্বের আধার ছিলেন, সেই তেজস্বিতা ও বীরত্বে উদয় সিংহের প্রকৃতি সমুন্নত হয় নাই। উদয় সিংহ প্রকৃত পক্ষে নিতান্ত ভীরু ও কাপুরুষ ছিলেন, প্রতাপ সিংহের জন্মদাতার এরূপ নিস্তেজ নারী-প্রকৃতি বীরভূমি চিতোরের ইতিহাসে নিতান্ত দুর্লভ। এই সময়ে আকবরের ন্যায় একজন সুযোদ্ধা ও দিগ্‌বিজয়-পটু সম্রাট্ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত না থাকিলে উদয় সিংহ চিতোরে সংযত-চিত্ত তপস্বীর ন্যায় কালাতিপাত করিতে পারিতেন। কিন্তু বিধাতা উদয় সিংহের ললাটে এরূপ শান্তি লিখেন নাই। সুতরাং চিতোরে থাকিয়াই তিনি কোমল-প্রকৃতি-নারী-জনোচিত সুখের অধিকারী হইতে পারিলেন না। এই সুখ-লাভের আশায় তাঁহাকে উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইল। তবে কি রাজপুত বিলাস-সুখের জন্য লালায়িত? তবে কি রাজপুতের আত্মা বিকৃত ও রাজপুতনা পূর্ব্ব-গৌরব-ভ্রষ্ট? রাজস্থানের থর্ম্মাপোলি ও কাঙ্গুা (দুর্গ-প্রাকার) তবে কি আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক? ইতিহাসের অনুসরণ কর, এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর পাইবে।

যে বৎসর উদয় সিংহের রাজ্য-প্রাপ্তিতে কমলমিয়রের প্রাসাদ হইতে আনন্দ-কোলাহল সমুত্থিত হয়, সেই বৎসরই

ক্রন্দন-ধ্বনির মধ্যে অমরকোটে একটী বালক জন্ম গ্রহণ করে। কমলমিয়রের আনন্দ-স্বর সমস্ত মিবারের পরিব্যাপ্ত হয়, অমরকোটের শোক-স্বর নগর-প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া বৃক্ষলতা-শূন্য বিজন মরুভূমির বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়। উদয় সিংহ সিংহাসনে অধিরোহণ করাতে কমলমিয়রের জনগণ সমবেত ব্যক্তিদিগকে মুক্তহস্তে ধন দান করে, অমরকোটের বালক জন্মগ্রহণ করাতে তাহার পিতা অন্য সম্পত্তির অভাবে একটী সামান্য কস্তুরী খণ্ড খণ্ড করিয়া সমবেত বন্ধু-জনের মধ্যে বিতরণ করেন। এক সময়ে চিতোরের উদয় সিংহের সহিত অমরকোটের বালকের এইরূপ প্রভেদ ছিল, এক সময়ে একের সিংহাসনাধিরোহণ ও অপরের জন্ম-গ্রহণ এইরূপ বিসদৃশ ঘটনায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। কিন্তু পরিবর্ত্তন-শীল সময়ের সহিত পরিশেষে এই মরু-প্রান্তবর্ত্তী বালকের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হয়। কালে এই বালকের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ হিমালয় হইতে সুদূর কুমারীকা পর্য্যন্ত ছাঁইয়া পড়ে, এবং কালে এই বালকের উদ্দেশে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" ধ্বনি ইন্দ্রপ্রস্থের বিচিত্র আমখাস হইতে সমুত্থিত হইয়া সুদূর গগনতলে পরিব্যাপ্ত হয়।

এই বালকের নাম আকবর; হোমায়ুন যখন রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রী-ভ্রষ্ট হইয়া দেশান্তরে পলায়িত, তখন বিস্তীর্ণ ভারত-মরুর এক খণ্ড ওয়েসিসে প্রাচীন সগিদ বংশীয়গণের মধ্যে ভারতের এই ভাবী সম্রাট্ জন্ম গ্রহণ করেন। হোমায়ুন যে রূপে রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া দুরবস্থায় পড়েন, তাহা

ইতিহাসে সবিশেষ বর্ণিত আছে। এস্থলে তদ্বিষয় উল্লেখের কোনও প্রয়োজন নাই ; কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পুত্রের জন্ম-সময়ে হোমায়ুনের ললাট হইতে রাজ-টীকা বিচ্যুত হইয়াছিল, হস্ত হইতে রাজ-দণ্ড অপহৃত হইয়াছিল এবং দেহ হইতে রাজ-পরিচ্ছদ অপসারিত হইয়াছিল, দিল্লীর অর্দ্ধ চন্দ্র-সুশোভিত পতাকা মোগলের পরিবর্ত্তে সুরবংশের শাসন-চিহ্ন প্রকাশ করিতেছিল, দিল্লীর রত্নখচিত সিংহাসন মোগল-বংশীয়ের পরিবর্ত্তে সুরবংশীয় সের সাহের দেহ-মহিমায় সুশোভিত হইতেছিল।

হোমায়ুন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দ্বাদশ বর্ষকাল দেশান্তরে অতিবাহিত করেন। এই অনতি-দীর্ঘ সময়ের সুরবংশীয় ছয় জন নৃপতি ক্রমে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সর্ব্ব শেষ নৃপতির নাম সেকন্দর। ১৫৫৪ খৃষ্টব্দে আকবরের পরাক্রমে সেকন্দর সুর পরাজিত ও রাজ্য-তাড়িত হয়েন। এই সময়ে আকবরের বয়স দ্বাদশ বৎসর, এই বয়সেই তাঁহার পিতামহ ফর্গনার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। সেকন্দরের পর হোমায়ুন পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল এই রাজত্ব-সুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির ছয় মাস পরে তিনি একদা স্বীয় পুস্তকালয়ের সিঁড়ি হইতে পতিত হইয়া দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হয়েন। এই আঘাতেই তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হয়। প্রাচ্য ভুপতিগণ পুস্তকালয়ে থাকিয়া পুস্তক পাঠে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহাদের নিকট লক্ষ্মীর ন্যায় সরস্বতীরও সমাদর ছিল,

তাঁহাদের সভা পণ্ডিত-মণ্ডলীতে সর্ব্বদা সমুজ্জ্বল থাকিত। ফ্রান্সের চতুর্থ হেন্‌রী অথবা ইংলণ্ডের এলিজাবেথও এবিষয়ে প্রাচ্য ভূপতিদিগকে অতিক্রম করিতে পারেন না। জর্ক্ষতিস্ হইতে মোগলবংশ পর্য্যন্ত সকলের সভাতেই বিদ্যার সমাদর ছিল। প্রাচ্য সভামণ্ডপ যে সমস্ত কবি, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও গণিতবিৎ প্রভৃতিতে গৌরবান্বিত থাকিত, ইতিহাস হইতে তাঁহাদের নাম ও কীর্ত্তিকলাপ কখনও বিলুপ্ত হইবে না।

হোমায়ুনের মৃত্যুর পর আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময়ে সাম্রাজ্যের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। হোমায়ুনের রাজচ্যুতির পর অধিকাংশ প্রদেশই একে একে দিল্লীর শাসন-ভ্রষ্ট হইয়া স্বাধীন হইয়াছিল। আকবর ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে এইরূপ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইলেন। কিন্তু বহরাম খাঁর সাহস ও কার্য্য-পরায়ণতায় অচিরাৎ দিল্লীর সাম্রাজ্য পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থাপন্ন হইল। বহরাম কাল্পী, চন্দেরী, কলিঞ্জর, বুন্দেলখণ্ড ও মালব দিল্লীর অধীনস্থ করিলেন। ভারতীয় সলি* এইরূপে ভারত-হৃদয়ে মোগল-শাসন বদ্ধমূল করিয়া পরিশেষে এই মোগল-শাসনের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধারণ করেন। যাহা হউক বহরামের এইরূপ বিদ্রোহভাবে আকবরের কোন অনিষ্ট হইল না। আকবর অচি-

---

* সলি ফ্রান্সের অধিপতি চতুর্থ হেন্‌রীর রাজস্ব-সচিব ছিলেন। রাজনীতিতে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল।

রাৎ অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে সাম্রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে শাসন-দণ্ড পরিচালন করিতে লাগিলেন।

সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইলে আকবর দিগ্‌-বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। মালদেবের শত্রুতার প্রতি-শোধ জন্যই হউক, অথবা অন্য কারণেই হউক রাজপুত রাজ্যই তাঁহার লক্ষ্যস্থল হইয়া উঠে। আকবর মাড়বারের একটী নগর নষ্ট করিয়া ১৫৬৭ অব্দে চিতোরের বিরুদ্ধে সৈন্য চালন করেন।

যে রাজ্যে রাজত্ব আইনে নিবদ্ধ, রাজা কেবল প্রধান মাজিষ্ট্রেটের আইনের ন্যায় অনুগামী, সেই রাজ্য কি সুখময়! কিন্তু যে রাজ্যে আইনই রাজার অনুগামী, সেই রাজ্যের মঙ্গল অমঙ্গল রাজারই অনুগত হইয়া থাকে, রাজা ধর্ম্ম-পরায়ণ হইলে সেই রাজ্য উন্নতির শিখরে সমারূঢ় হয়, রাজা পাপ-পরায়ণ হইলে সেই রাজ্য অবনতির [illegible] চরম সীমায় পতিত হইয়া থাকে। রাজা শৌর্য্য, বীর্য্য ও সাহস-সম্পন্ন হইলে সেই রাজ্য অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে অটল থাকে, রাজা ভীরু-স্বভাব হইলে সেই রাজ্য শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত ও উৎসন্ন হইয়া যায়। দিল্লীর আকবর সাহ ও চিতোরের উদয় সিংহে এই শেষোক্ত রাজতা পরি-স্ফুট হইবে।

উদয় সিংহ যে বয়সে চিতোরের অধিপতি হয়েন, আক-বরও সেই বয়সে দিল্লীর শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন। উভয়ের মধ্যে এইরূপ বয়ঃক্রমের সাদৃশ্য থাকিলেও অন্যান্য অনেক

বিষয়ে বৈসাদৃশ্য ছিল। হোমায়ুন বাবরের নিকট যেরূপ কষ্ট-সহিষ্ণুতায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন, আকবরও হোমায়ুনের নিকট সেইরূপ কষ্ট-সহিষ্ণুতা অভ্যাস করেন, পিতার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আকবর ক্রমে কষ্ট-সহিষ্ণু ও পরিশ্রম-শীল হইয়া উঠেন। এদিকে বহরাম খাঁ, আবুল ফজিল ও তোডর মল্লের ন্যায় বিচক্ষণ যোদ্ধা ও রাজনীতিজ্ঞগণ শাসন-কার্য্যে আকবরের সাহায্যকারী হয়েন। যে সৌভাগ্য-নক্ষত্র তাঁহার জন্ম সময়ে অমরকোটের মরু-প্রান্তর উদ্ভাসিত করিয়াছিল,, দিল্লীর রাজত্ব সময়ে ক্রমেই তাহা উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে। উদয় সিংহ এরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারেন নাই, এরূপ কষ্ট-সহিষ্ণু হইয়াও শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন নাই। মোগল ও রাজপুতের মধ্যে এইরূপ সৌভাগ্য ও শাসনোচিত ক্ষমতার বৈষম্য ছিল। একজন অদৃষ্টের বিপাকে পড়িয়া নানা স্থানে [illegible] বন-চরিত্রে দূরদর্শিতা [illegible] করিয়াছিলেন, অন্য[illegible]

সাহস ও কার্য্য-পরায়ণতায় অচিরাৎ দিল্লী[illegible], রাজ্য পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থাপন্ন হইল। বহরাম কাল্পী, চন্দেরী, কলিঞ্জর, বুন্দেলখণ্ড ও মালব দিল্লীর অধীনস্থ করিলেন। ভারতীয় সলি* এইরূপে ভারত-হৃদয়ে মোগল-শাসন বদ্ধমূল করিয়া পরিশেষে এই মোগল-শাসনের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধারণ করেন। যাহা হউক বহরামের এইরূপ বিদ্রোহ-ভাবে আকবরের কোন অনিষ্ট হইল না। আকবর অচি-

* সলি ফ্রান্সের অধিপতি চতুর্থ হেন্‌রীর রাজস্ব-সচিব ছিলেন। রাজনীতিতে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল।

ইনিও মূর্ত্তিমান্ ধ্বংশের ন্যায় রাজপুতদিগের বিরুদ্ধে ধাবমান হয়েন। যে ধর্ম্মান্ধতা পাঠান-রাজত্বে আধিপত্য করিয়াছিল, তাহা মোগল সাম্রাজ্যের শিরোভূষণ আকবরের রাজত্বেও পরিস্ফুট হয়। আকবর অন্ধ-বিশ্বাসী আলার ন্যায় রাজপুতের আরাধ্য একলিঙ্গের মন্দিরের উপকরণ দিয়া আপনাদিগের ধর্ম্মপুস্তক কোরাণের জন্য মম্বা (বেদি) নির্ম্মাণ করিতেও ক্রটী করেন নাই। এরূপ অন্ধ-বিশ্বাসী হইলেও এক সময়ে আকবরের কীর্ত্তিতে মোগল-সাম্রাজ্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল, এক সময়ে আকবর ঈশ্বর-পদ-বাচ্য হইয়া চতুর্দ্দিকে আপনার মহিমা বিস্তার করিয়াছিলেন।

আকবর সৈন্যদল লইয়া চিতোর আক্রমণ করিলে উদয় সিংহ জয়মল নামক বিদনোরের প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীরের হস্তে নগর রক্ষার ভার দিয়া স্বয়ং অপসৃত হয়েন। জয়মল, সাহস বীরত্ব প্রভৃতি শূরোচিত গুণ সমূহে সমলঙ্কৃত ছিলেন ; তিনি বিশিষ্ট দক্ষতা সহকারে চিতোর সামার পতিত হইয়া থাকে। রাজা শৌর্য্য, বীর্য্য ও সাহস-সম্পন্ন হইলে সেই রাজ্য অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে অটল থাকে, রাজা ভীরু-স্বভাব হইলে সেই রাজ্য শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত ও উৎসন্ন হইয়া যায়। দিল্লীর আকবর সাহ ও চিতোরের উদয় সিংহে এই শেষোক্ত রাজতা পরিস্ফুট হইবে।

উদয় সিংহ যে বয়সে চিতোরের অধিপতি হয়েন, আকবরও সেই বয়সে দিল্লীর শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন। উভয়ের মধ্যে এইরূপ বয়ঃক্রমের সাদৃশ্য থাকিলেও অন্যান্য অনেক

বিষয়ে বৈসাদৃশ্য ছিল। হোমায়ুন বাবরের নিকট যেরূপ কষ্ট-সহিষ্ণুতায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন, আকবরও হোমায়ুনের নিকট সেইরূপ কষ্ট-সহিষ্ণুতা অভ্যাস করেন, পিতার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আকবর ক্রমে কষ্ট-সহিষ্ণু ও পরিশ্রম-শীল হইয়া উঠেন। এদিকে বহরাম খাঁ, আবুল ফজিল ও তোডর মল্লের ন্যায় বিচক্ষণ যোদ্ধা ও রাজনীতিজ্ঞগণ শাসন-কার্য্যে আকবরের সাহায্যকারী হয়েন। যে সৌভাগ্য-নক্ষত্র তাঁহার জন্ম সময়ে অমরকোটের মরু-প্রান্তর উদ্ভাসিত করিয়াছিল,, দিল্লীর রাজত্ব সময়ে ক্রমেই তাহা উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে। উদয় সিংহ এরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারেন নাই, এরূপ কষ্ট-সহিষ্ণু হইয়াও শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন নাই। মোগল ও রাজপুতের মধ্যে এইরূপ সৌভাগ্য ও শাসনোচিত ক্ষমতার বৈষম্য ছিল। একজন অদৃষ্টের বিপাকে পড়িয়া নানা স্থানে যাইয়া মানব-চরিত্রে দূরদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, অন্য জন প্রাকার-বেষ্টিত পর্ব্বত-দুর্গে জন্মিয়া সঙ্কুচিত বিষয়ের সঙ্কুচিত সীমায় আবদ্ধ ছিলেন, অবারিত সংসার একজনের বৈষয়িক জ্ঞান প্রসারিত করিয়াছিল, সঙ্কীর্ণ গিরিকন্দর অপরের বৈষয়িক জ্ঞান সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

আকবরই মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত সংস্থাপয়িতা ও রাজপুত-স্বাধীনতার প্রথম গৌরব-হারী। সাহেব উদ্দীন ও আলার ন্যায় ইনিও রণমত্ত রাজপুতদিগকে তরবারির আঘাতে খণ্ড বিখণ্ড করেন, সাহেব উদ্দীন ও আলার ন্যায়

ইনিও মূর্ত্তিমান্ ধ্বংশের ন্যায় রাজপুতদিগের বিরুদ্ধে ধাবমান হয়েন। যে ধর্ম্মান্ধতা পাঠান-রাজত্বে আধিপত্য করিয়াছিল, তাহা মোগল সাম্রাজ্যের শিরোভূষণ আকবরের রাজত্বেও পরিস্ফুট হয়। আকবর অন্ধ-বিশ্বাসী আলার ন্যায় রাজপুতের আরাধ্য একলিঙ্গের মন্দিরের উপকরণ দিয়া আপনাদিগের ধর্ম্মপুস্তক কোরাণের জন্য মম্বা (বেদি) নির্ম্মাণ করিতেও ক্রুটী করেন নাই। এরূপ অন্ধ-বিশ্বাসী হইলেও এক সময়ে আকবরের কীর্ত্তিতে মোগল-সাম্রাজ্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল, এক সময়ে আকবর ঈশ্বর-পদ-বাচ্য হইয়া চতুর্দ্দিকে আপনার মহিমা বিস্তার করিয়াছিলেন।

আকবর সৈন্যদল লইয়া চিতোর আক্রমণ করিলে উদয় সিংহ জয়মল নামক বিদনোরের প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীরের হস্তে নগর রক্ষার ভার দিয়া স্বয়ং অপসৃত হয়েন। জয়মল, সাহস বীরত্ব প্রভৃতি শূরোচিত গুণ সমূহে সমলঙ্কৃত ছিলেন; তিনি বিশিষ্ট দক্ষতা সহকারে চিতোর রক্ষার বন্দোবস্ত করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে চিতোর দীর্ঘকাল তাঁহার রক্ষাধীন থাকে না, জয়মল একদা রাত্রিকালে মশালের আলোকে নগরের ভগ্ন প্রাচীরের সংস্করণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে আকবর সাহ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, লক্ষ্য শুদ্ধি পূর্ব্বক তৎপ্রতি গুলি নিক্ষেপ করেন। গুলির আঘাতে জয়মলের তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়। এইরূপ গুপ্ত হত্যা আকবরের চরিত্রের একটী দেদীপ্যমান কলঙ্ক। সম্মুখ যুদ্ধ করাই যুদ্ধবীরের চিরন্তন পদ্ধতি, গোপনে নিরস্ত্র শত্রুর প্রাণসংহার করা নৃশংসতা ও কাপুরুষতার

লক্ষণ, সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, আকবর অন্যান্য সদ্‌গুণ-সমূহের অধিকারী হইয়াও প্রস্তাবিত স্থলে এইরূপ নৃশংসতা ও কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছেন।

সেনাপতির বিরহে চিতোর-বাসিগণ দিশাহারা হইয়া পড়ে। এদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের প্রধান প্রধান বীরগণের পতন হয়। অবশেষে পুত্ত চিতোর-সৈন্যের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। পুত্ত ষোড়শবর্ষীয় বালক। কিন্তু এই বালকের হৃদয়ও সাহসে অনমনীয় ছিল। বস্তুতঃ শৌর্য্য ও বীর্য্যে পুত্ত পৃথিবীর আরাধ্য দেবতা, স্বদেশ-বৎসলতার জন্য পুত্তের নাম অমরশ্রেণীতে নিবেশিত হইবার যোগ্য। পিতা রণস্থলে দেহ ত্যাগ করিলে পুত্ত অতুলনীয় সাহস সহকারে যুদ্ধে যাইতে সমুদ্যত হয়েন। স্পার্টার মহিলার ন্যায় তাঁহার মাতা তাঁহাকে সমর-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া "রণস্থলে পলায়ন অপেক্ষা জন্মভূমির রক্ষার তরে মৃত্যুও শ্রেয়স্কর" বলিয়া বিদায় দেন। পুত্ত মাতৃ-আজ্ঞা পালনে প্রতিশ্রুত হইয়া রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। পুত্তের অসাধারণ পরাক্রমে যবন সৈন্য বিধ্বস্ত-প্রায় হইয়া উঠে। এইরূপ লোকাতীত উৎসাহ সহকারে যুদ্ধ করিয়া পুত্ত মাতৃ-আজ্ঞা পালন করেন। আকবর সাহ শত্রুর শূরোচিত গুণ বিস্মৃত হয়েন নাই। তিনি এবিষয়ে বিশিষ্ট উদারতা দেখাইয়া প্রকৃত যুদ্ধবীরের সম্মান রক্ষা করেন। জয়মল ও পুত্তের বীরত্বে আকবরের হৃদয় এতদূর আকৃষ্ট হয় যে, তিনি স্বীয় লেখনীতে তাঁহাদের অক্ষয় কীর্ত্তি বর্ণনা করিতে ক্রুটী করেন নাই। এতদ্ব্যতীত আকবর তাঁহার দিল্লীস্থ প্রাসাদ-দ্বারের উভয় পার্শ্বে

দুটী প্রকাণ্ডাকার হস্তী নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার উপর জয়মল ও পুত্তর প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত করেন। বিখ্যাত ভ্রমণকারী বার্ণিয়ারের সময়েও এই প্রতিমূর্ত্তিদ্বয় যথাযথ অবস্থায় অবস্থিত ছিল। আকবর এইরূপে পরাক্রান্ত শত্রুর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

পুত্তের প্রাণ-বায়ুর সহিত চিতোরের গৌরব অন্তর্হিত হয়। চিতোরবাসিগণ অবিলম্বে শোচনীয় জোহরের অনুষ্ঠান করে। আট সহস্র রাজপুত একত্রিত হইয়া শেষ বীরা* ভোজন করেন। অপরদিকে রাজপুত মহিলাগণের চিতানলের শিখা গগনস্পর্শী হইয়া উঠে। এইরূপ করাল নর-শোণিত-প্রবাহ ও করাল হুতাশন-শিখা দেখিয়া চিতোর-রাজলক্ষ্মী জন্মের মত চিতোর হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

কার্থেজের প্রসিদ্ধ হানিবল কানি সমরে জয়ী হইলে আপনার কৃতকার্য্যতার পরিচয়ার্থ রোমীয়দিগের অঙ্গুরীয়ক সমূহ আহরণ করিয়া ধামা দ্বারা পরিমাণ করিয়াছিলেন, আকবরও এইরূপ রাজপুতদিগের গলাভরণ সমূহ (জিনার) উন্মোচন করিয়া পরিমাণ করেন। পরিমাণে এই আভরণ ৭৪½ মণ হয়। রাজস্থানের ব্যবসায়িগণের মধ্যে পত্রের পৃষ্ঠে এই ৭৪½ এর অঙ্কপাতের পদ্ধতি আছে, ইহার অর্থ এই, যাঁহারা এই পত্র উন্মোচন করিবেন, চিতোর-ধ্বংসের সমস্ত

* বীরা অর্থাৎ সজ্জিত তাম্বূল। বিদায় সময়ে রাজপুতদিগের মধ্যে বীরা প্রদানের পদ্ধতি আছে।

প্রত্যবায়-ভার তাহাদের স্কন্ধে পতিত হইবে। অনেক স্থানে অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পদ্ধতির প্রচার দৃষ্ট হয়। বহুশত বৎসর অতীত হইল, চিতোর বিধ্বস্ত হইয়াছে; অদ্যাপি ৭৪½ পত্র-পৃষ্ঠে জাজ্জ্বল্যমান থাকিয়া এই শোচনীয় সংবাদ সাধারণের কর্ণে কর্ণে কহিয়া বেড়াইতেছে।

উদয় সিংহ চিতোর পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে আরণ্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন, পরিশেষে তথা হইতে অর্ব্বলী পর্ব্বতের উপত্যকায় উপস্থিত হয়েন। চিতোর-ধ্বংশের পূর্ব্বে উদয় সিংহ এই উপত্যকার প্রবেশ-পথে একটী হ্রদ খনন করাইয়া তাহার উদয়সাগর নাম রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি এই স্থানে একটী নগর স্থাপন করিয়া নিজের নামানুসারে উহা উদয়পুর নামে অভিহিত করেন।

উদয় সিংহ চিতোর-ধ্বংশের পর চারি বৎসর জীবিত ছিলেন। ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার ২৫টী পুত্র সন্তানের মধ্যে প্রতাপ সিংহ পৈত্রিক উপাধি ও গদির উত্তরাধিকারী হয়েন।

এইরূপ প্রতাপ বংশানুগত "রাণা" উপাধি ধারণ করিলেন, এইরূপে মিবারের গৌরব-সূর্য্য সমুজ্জ্বল হইবার সূত্রপাত হইল। যদিও চিতোর বিধ্বস্ত হইয়াছিল, যদিও যবনের পরাক্রমে রাজপুতগণ হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি প্রতাপের হৃদয় বিচলিত হয় নাই। তিনি চিতোর উদ্ধার করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতক্ষণ বাপ্পা রাওর মন্ত্রপুত শোণিতের শেষ বিন্দু ধমনীতে বর্ত্তমান থাকিবে, ততক্ষণ তিনি এই সঙ্কল্প হইতে বিরত

হইবেন না; প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতক্ষণ গোহিলোট বংশের গৌরব মিবারের ইতিহাসে অঙ্কিত থাকিবে, ততক্ষণ তিনি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিবেন না। প্রতাপ এইরূপ স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া সমীহিত সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, উচ্চ-তর সঙ্কল্প, মহত্তর সাধনা তাঁহার হৃদয়কে উচ্চতর গ্রামে আরোহিত করিল, তিনি স্বদেশ-হিতৈষণা, স্বজাতি-প্রিয়-তায় উদ্দীপ্ত হইয়া অনুচর-বর্গকে উৎসাহিত করিতে লাগি-লেন। প্রতাপের এইরূপ উৎসাহ, এইরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা দেখিয়া অনেকে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল বটে, কিন্তু প্রধান প্রধান রাজপুতগণ মোগলের পক্ষ অবলম্বন করিলেন, মাড়-বার, আম্বর, বিকেনিয়র এবং বুঁদীর অধিপতিগণও স্বজাতি-প্রিয়তায় জলাঞ্জলি দিয়া আকবরের পক্ষ সমর্থনে ক্রটী করিলেন না। অধিক কি, তাঁহার ভ্রাতাও তাঁহাকে পরি-ত্যাগ করিয়া শত্রু-দলে মিশিলেন, কিন্তু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ প্রতাপ ইহাতেও হতাশ্বাস হইলেন না, তিনি বাপ্পা রাওর মন্ত্রপূত শোণিত কলঙ্কিত না করিয়া স্বদেশের উদ্ধার সাধনার্থ স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিলেন।

প্রতাপ এইরূপে স্বজাতি—স্ববন্ধু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ২৫ বৎসর কাল দুর্ব্বারপরাক্রম মোগল শাসনের বিরুদ্ধা-চরণ করেন। এই সময়ে এক এক বার তাঁহার দুরবস্থার এক শেষ হয়, স্বয়ং পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া স্ত্রী পুত্রের সহিত পার্ব্বত্য ফল খাইয়া কষ্টে জীবনাতিপাত করেন, তথাপি তিনি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। এরূপ স্বাধীনত্ব-প্রিয়তা পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ।

চিতোর-ধ্বংসের স্মরণার্থ প্রতাপ সর্ব্বপ্রকার বিলাস দ্রব্যের উপভোগ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষ-পত্রে অন্ন আহার করিতেন, দুগ্ধফেণ-নিভ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া তৃণাচ্ছাদিত শয্যায় শয়ন করিতেন এবং ক্ষৌর-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া লম্বমান দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিতেন। তাঁহার আজ্ঞায় অগ্রবর্ত্তী রণ-দুন্দুভি সকলের পশ্চাতে ধ্বনিত হইত। মিবারের এই শোক-চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, অদ্যাপি প্রতাপের বংশীয়গণ স্বর্ণ ও রৌপ্যময় আহার-পাত্রের নীচে বৃক্ষ-পত্র ও শয্যার নীচে তৃণ রাখিয়া থাকেন।

প্রতাপ পৈত্রিক গদিতে আরোহণ করিয়া কতিপয় অভিজ্ঞ সর্দ্দারের সাহায্যে শাসন-কার্য্য ও রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ের উৎকর্ষ সাধন করিতে লাগিলেন; যে কএকটী পার্ব্বত্য দুর্গ হস্তে ছিল, তৎসমুদয় দৃঢ়ীভূত করিলেন। যত দিন মোগলদিগের সহিত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, তত দিন তাঁহার আজ্ঞায় ববনাস ও বেরিস্ নদীর উভয় তীরবর্ত্তী উর্ব্বর ভূমিতে কেহই থাকিতে পারিত না। নিজের আদেশ যথাবিধি পালিত হয় কি না, তাহার প্রতি প্রতাপের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি প্রায়ই কতিপয় অশ্বারোহি-সমভিব্যাহারে স্থানীয় লোকের কার্য্য-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার কঠিন আদেশে মরুভূমির নিস্তব্ধতা উর্ব্বর ক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল, তৃণরাজি শস্য সমূহের স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিল, গন্তব্য পথ কণ্টকাকীর্ণ বাব্‌লা বৃক্ষে অগম্য হইয়াছিল এবং মনুষ্যের আবাস-

ভূমি বিবিধ বন্য জন্তুর বিহার-ক্ষেত্র হইয়াছিল। প্রতাপ এইরূপে সমুদয় ভূমি বন্য ভাবে পরিপূর্ণ করিয়া বিজেতা মোগলদিগের লাভের পথ অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন।

যে সমস্ত রাজপুত মোগলদিগের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, প্রতাপ তাঁহাদিগকে নিতান্ত ঘৃণা করিতেন। আম্বরের রাজা মানসিংহের সহিত আকবরের এইরূপ সম্বন্ধ ছিল বলিয়া প্রতাপ মানসিংহের সহিত সমুদয় সামাজিক সম্বন্ধ উঠাইয়া দেন। একদা মানসিংহ সোলাপুর অধিকার করিয়া হিন্দুস্থানে আসিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎকারের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন, প্রতাপ সিংহ এই সময়ে কমলমিয়রে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি আম্বরাধীশ্বরের অভিনন্দন জন্য উদয় সাগরের তীরে উপস্থিত হইলেন। অবিলম্বে এই স্থানে একটী সমৃদ্ধ ভোজের আয়োজন হইল, প্রতাপের পুত্র কুমার ওমরা রাজা মানের অভ্যর্থনার জন্য এইস্থলে উপস্থিত ছিলেন; মান সিংহ নির্দ্দিষ্ট স্থলে সমাগত হইলে তিনি পিতার অনুপস্থিতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে ভোজন-স্থলে বসাইলেন। মানসিংহ প্রতাপের সহিত একত্র ভোজন করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করাতে প্রতাপ দুঃখ সহকারে বলিলেন, যিনি তুরুক্‌কে নিজের ভগিনী সম্প্রদান করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ যিনি তরুকের সহিত আহারও করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিতে পারেন না। রাজা মান প্রতাপ সিংহের এই বাক্যে অপমান জ্ঞান করিয়া ভোজন-স্থল হইতে

গাত্রোত্থান করেন, প্রতাপ সিংহ এই সময়ে ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, রাজা মান অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, "যদি আমি তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব না করি তাহা হইলে আমার নাম মান সিংহ নহে"। মান সিংহ এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলে পবিত্র গঙ্গাজল দ্বারা ভোজন-স্থান ধৌত করা হয়, এবং যাহারা এই ভোজের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন, তাহরা স্নান করিয়া বস্ত্রান্তর গ্রহণ করেন। এই সমস্ত বিবরণ আকবরের শ্রুতি-প্রবিষ্ট হইল আকবর মানসিংহের প্রতি প্রতাপ সিংহের তাদৃশ ব্যবহারে আপনাকে পর যার নাই অপমানিত জ্ঞান করিলেন। অবিলম্বে এই অপমানের প্রতিশোধ জন্য সংগ্রামের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। যুবরাজ সেলিম সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া মানসিংহ ও মহব্বত খাঁর সহিত প্রতাপের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

প্রতাপ দ্বাবিংশতি সহস্র রাজপুতের সাহস ও স্বদেশীয় পর্ব্বতমালার উপর নির্ভর করিয়া আকবর-তনয়ের গতি প্রতিরোধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। যে স্থলে তাহার সৈন্য সন্নিবেশিত হয়, তাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার প্রায় আট মাইল। এই স্থান কেবল পর্ব্বত, অরণ্য ও ক্ষুদ্র নদীতে সমাবৃত। ইহার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ সকল দিকেই অত্যুচ্চ পর্ব্বত লম্বভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই গিরিসঙ্কট হলদিঘাট বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। প্রতাপ মিবারের আশা-ভরসা-স্থানীয় রাজপুতদিগের সহিত এই গিরি-সঙ্কট আশ্রয় করিয়া দণ্ডায়মান হয়েন। মোগল সৈন্য সমুপস্থিত

হইলে তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হয়। রাজপুতগণ অসামান্য পরাক্রম—অশ্রুতপূর্ব্ব সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া সমরাঙ্গনে শায়িত হয়; বিজয়-শ্রী মোগলের অঙ্ক-শায়িনী হয়েন। চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুতের শোণিতে হলদিঘাটের ক্ষেত্র রঞ্জিত হয়। প্রতাপ জয়াশায় নিরাশ হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করেন।

এইরূপে হলদিঘাট সমরের অবসান হয়, এইরূপে চতুর্দশ সহস্র রাজপুত হলদিঘাট-রক্ষার্থ অম্লান বদনে, অসঙ্কুচিত চিত্তে আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করে। ইতিহাসের আদরের ধন ভারতবর্ষ এই লোকাতীত বীরত্বের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। যদি কেহ রণ-তরঙ্গায়িত গ্রীসের সহিত ভারতের তুলনা করিতে চাহেন, যদি কেহ অলোকসামান্য গ্রীস সেনাপতিদিগের বিচরণ পাঠ করিয়া ভারতের দিকে চাহিয়া দেখেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে অসঙ্কুচিত হৃদয়ে বলিব, হলদিঘাট ভারতের থর্ম্মাপোলী, আর প্রতাপ সিংহ ভারতের লিওনিদস। হলদিঘাট কিছু সামান্য যুদ্ধক্ষেত্র নহে, প্রতাপ সিংহ কিছু সামান্য যুদ্ধবীর নহেন; যদি পৃথিবীতে কোন পুণ্যপুঞ্জময় মহাতীর্থ বর্ত্তমান থাকে; যদি পবিত্র স্বাধীনতার পবিত্র ধ্বজার কোন বিলাসক্ষেত্র থাকে, তবে তাহা সেই হলদিঘাট, যদি কোন বীর পুরুষ বীরেন্দ্র-সমাজে প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইয়া থাকেন, যদি কোন অদীনপরাক্রম মহাপুরুষ আলোকসামান্য দেশানুরাগ জন্য অমরসমিতিতে স্তুত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি সেই প্রতাপ সিংহ। ফলে হলদিঘাট ষোড়শ শতাব্দীর একটী

পরম পবিত্র যুদ্ধ-ক্ষেত্র। কবির রসময়ী কবিতায় ইহা অনন্ত-কাল লীলা করিবে, ঐতিহাসিকের অপক্ষপাত বর্ণনায় ইহা অনন্তকাল ঘোষিত হইবে। প্রতাপ সিংহ অনন্তকাল বীরেন্দ্র-সমাজে হৃদয়-গত শ্রদ্ধার পূজা পাইবেন এবং পবিত্র হইতেও পবিত্রতর হইয়া অনন্তকাল অমর-শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট থাকিবেন।

প্রতাপ অনুচর-বিহীন হইয়া নীলবর্ণ তেজস্বী চৈতক অশ্ব আরোহণে রণস্থল পরিত্যাগ করেন। প্রতাপের ন্যায় এই অশ্বও তেজস্বিতায় রাজস্থানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। যখন দুই জন মোগল সর্দ্দার প্রতাপের পশ্চাদ্ধাবমান হয়, তখন চৈতক লম্ফ প্রদানে একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সরিৎ পার হইয়া স্বীয় প্রভুকে রক্ষা করে। কিন্তু প্রতাপের ন্যায় চৈতকও যুদ্ধ-স্থলে আহত হইয়াছিল। এই আঘাতে পথি মধ্যে চৈতকের প্রাণ বিয়োগ হয়। প্রিয়তম বাহনের স্মরণার্থ প্রতাপ এই স্থলে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। অদ্যাপি এই স্থান "চৈতক্কা চবুত্র" বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

১৫৭৬ খৃীঃ অব্দের জুলাই মাসে চিরস্মরণীয় হলদিঘাট মিবারের গৌরব-স্থানীয় রাজপুতগণের অনন্তপ্রবাহ শোণিত-স্রোতে প্রক্ষালিত হয়। এদিকে সেলিম বিজয়-গৌরবে স্ফীত হইয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। কমলমিয়র ও উদয়পুর-শত্রুর হস্তে পতিত হইল, প্রতাপ সন্তান-বর্গের সহিত এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে এক অরণ্য হইতে অন্য অরণ্যে এক গহ্বর হইতে অন্য গহ্বরে যাইয়া অনুসরণকারী মোগলদিগের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বৎসরের

পর বৎসর পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, তথাপি প্রতাপের কষ্টের অবধি রহিল না, প্রতি নূতন বৎসর নূতন নূতন কষ্ট সঞ্চয় করিয়া প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। এক সময়ে বিশ্বাসী ভিলগণ প্রতাপের পরিবারবর্গকে একটী নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া আহার দ্বারা তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা করে। প্রতাপের এইরূপ অসাধারণ স্বার্থ-ত্যাগ ও অশ্রুত-পূর্ব্ব কষ্টে সদাশয় শত্রুর হৃদয়ও আর্দ্র হইল। দিল্লীর প্রধান রাজকর্ম্মচারী ঈদৃশী স্বদেশ-হিতৈষণায় বিমোহিত হইয়া প্রতাপকে সম্বোধন পূর্ব্বক এই ভাবে একটী কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেন, "পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নহে। ভূমি ও সম্পত্তি অদৃশ্য হইবে; কিন্তু মহৎ লোকের ধর্ম্ম কখনও বিলুপ্ত হইবে না। প্রতাপ সম্পত্তি ও ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু কখনও মস্তক অবনত করেন নাই। হিন্দুস্থানের সমুদয় রাজগণের মধ্যে তিনিই কেবল স্বীয় বংশের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন"। প্রতাপ এইরূপে বিধর্ম্মী শত্রুরও প্রশংসা-ভাজন হইয়া বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন। প্রাণাধিক বনিতা ও সন্তানগণের কষ্ট এক এক সময় তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। দুরন্ত মোগলগণ এ পর্য্যন্তও ক্ষান্ত হইল না। তিনি পাঁচবার খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করেন, কিন্তু সুবিধার অভাবে পাঁচবারই তাহা পরিত্যাগ করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন-পর হয়েন। একদা তাঁহার মহিষী ও পুত্রবধূ মাল-নামক ঘাসের বীজ দ্বারা কয়েক খানি রুটী প্রস্তুত করেন এবং এই খাদ্যের একাংশ সেই সময়ের ভোজনের জন্য রাখিয়া অপরাংশ

ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেন। প্রতাপের একটী দুহিতা এই রুটীর কিয়দংশ লইয়া ভোজন করিতেছিল, এমন সময়ে একটী বন্য মার্জ্জার তাহার হস্ত হইতে সেই রুটী খানি লইয়া যায়। বালিকা আর্ত্ত স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠে, প্রতাপ অদূরে বসিয়া স্বীয় শোচনীয় দশা-বিপর্য্যয়ের বিষয় ভাবিতে ছিলেন, দুহিতার আর্ত্ত স্বরে চমকিত হইয়া দেখেন, রুটী খানি অপহৃত হইয়াছে। প্রতাপ অম্লান বদনে হলদি-ঘাটে স্বদেশীয়গণের শোণিত-স্রোতঃ দেখিয়াছিলেন, অম্লান বদনে স্বদেশীয়দিগকে স্বদেশের সম্মান-রক্ষার্থ আত্ম-প্রাণ উৎসর্গ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, অম্লান বদনে রাজপুত জাতি—রাজপুত বংশের গৌরব রক্ষার জন্য রণস্থল-বর্ত্তিনী করাল সংহারমূর্ত্তির বিভীষিকায় তাচ্ছীল্য প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই ভাবে দেহ বিসর্জ্জনের জন্যই রাজপুতগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।" কিন্তু এক্ষণে তিনি স্থির-চিত্তে তনয়ার কাতরতা দেখিতে সমর্থ হইলেন না। স্নেহের শৈশব-দোলা, প্রীতির বিলাস-ভূমি বালিকাকে আর্ত্ত স্বরে কাঁদিতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইল, যেন শত শত কাল ভুজঙ্গ আসিয়া সর্ব্বাঙ্গে দংশন করিল, শিরায় শিরায় সেই তীব্র বিষ-জ্বালা প্রসৃত হইল। প্রতাপ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, আপনার কষ্ট দূর করিবার জন্য আকবরের নিকট আত্ম-সমর্পণের অভিপ্রায় জানাইলেন।

প্রতাপের এইরূপ অধীনতা-স্বীকারের সম্বাদে আকবর নগর-মধ্যে মহোল্লাস-সহকারে উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিলেন। প্রতাপ আকবরের নিকট যে পত্র

প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই পত্র পৃথ্বীরাজ দেখিতে পাই-লেন। পৃথ্বীরাজ বিকেনিয়রের অধিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। স্বজাতি-প্রিয়তা ও স্বজাতি-হিতৈষণায় তাঁহার হৃদয় আতট পূর্ণ ছিল। তিনি প্রতাপকে নিরতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। প্রতাপ হঠাৎ দিল্লীশ্বরের নিকট অবনত-মস্তক হইবেন, ইহা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইল। পৃথ্বীরাজ আর কাল বিলম্ব না করিয়া নিম্ন লিখিত ভাবে কয়েকটী কবিতা রচনা পূর্ব্বক প্রতাপের নিকট প্রেরণ করিলেন :—

"হিন্দুদিগের সমস্ত আশা ভরসা হিন্দুজাতির উপরই নির্ভর করিতেছে। রাণা এক্ষণে সে সকল পরিত্যাগ করি-তেছেন। আমাদের সর্দ্দারগণের সে বীরত্ব নাই, নারীগণের সে সতীত্ব-গৌরব নাই। প্রতাপ না থাকিলে আকবর সকলকেই এই সমভূমিতে আনয়ন করিতেন। আমাদের জাতির বাজারে আকবর একজন দালাল; তিনি সক-লই কিনিয়াছেন, কেবল উদয়ের তনয়কে কিনিতে পারেন নাই। সকলেই হতাশ্বাস হইয়া নৌরোজার বাজারে আপনাদের অপমান দেখিয়াছেন, কেবল হামীরের বংশ-ধরকে অদ্যাপি সে অপমান দেখিতে হয় নাই। জগৎ জিজ্ঞাসা করিতেছে, প্রতাপের অবলম্বন কোথায়? পুরুষত্ব ও তরবারিই তাঁহার অবলম্বন। তিনি এই অব-লম্বন-বলেই ক্ষত্রিয়ের গর্ব্ব রক্ষা করিতেছেন। বাজারের এই দালাল কিছু চির দিন জীবিত থাকিবে না, এক দিন অবশ্যই ইহলোক হইতে অবসৃত হইবে। তখন আমাদের

জাতির সকলেই পরিত্যক্ত ভূমিতে রাজপুত-বীজের বপন জন্য প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইবে। যাহাতে এই বীজ রক্ষিত হয়, যাহাতে ইহার পবিত্রতা পুনর্ব্বার সমুজ্জ্বল হইতে পারে, তাহার জন্য সকলেই প্রতাপের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।"

পৃথ্বীরাজের এই উৎসাহ-বাক্য শতসহস্র রাজপুতের তুল্য বলকারক হইল। ইহা প্রতাপের মুহ্যমান দেহে জীবনী শক্তি প্রদান করিল এবং তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্বদেশের গৌরবকর মহৎ কার্য্য সাধনে সমুত্তেজিত করিল। প্রতাপ দিল্লীশ্বরের নিকট অবনতি স্বীকারের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু এই সময়ে বর্ষার এরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, যে প্রতাপ কিছুতেই পর্ব্বত-কন্দরে থাকিতে না পারিয়া শোণিত-রঞ্জিত মিবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মরুভূমি অতিবাহন করিয়া সিন্ধু নদের তটে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই-সঙ্কল্প সিদ্ধির মানসে তিনি পরিবার-বর্গ ও মিবারের কতিপয় বিশ্বস্ত রাজপুতের সহিত আর্ব্বলী হইতে নামিয়া মরুপ্রান্তে উপনীত হইলেন। এই সময়ে প্রতাপের মন্ত্রী তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের সঞ্চিত সমস্ত ধন আনিয়া প্রতাপের নিকট উপস্থিত করেন, এই সম্পত্তি এত ছিল যে, ইহা দ্বারা দ্বাদশ বর্ষকাল পঞ্চবিংশতি সহস্র ব্যক্তির ভরণপোষণ নির্ব্বাহিত হইতে পারিত। কৃতজ্ঞতার এই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তে প্রতাপ পুনর্ব্বার সাহস সহকারে অভীষ্ট মন্ত্র সাধনে সমুদ্যত হইলেন। অবিলম্বে অনুচরবর্গ একত্রিত হইল।

প্রতাপ ইহাদিগকে লইয়া মোগল সৈন্য পরাজয় পূর্ব্বক কমলমিয়র পুনরধিকার ও বিলুণ্ঠন করিলেন। ইহার পর একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধেই চিতোর, আজমীর ও মণ্ডলগড় ব্যতীত সমস্ত মিবার প্রদেশ প্রতাপের পদানত হইল। কিন্তু এইরূপ বিজয়-শ্রীতে পরিশোভিত হইলেও প্রতাপ জীবনের শেষ অবস্থায় শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। পর্ব্বত-শিখরে সমারূঢ় হইলেই তাঁহার নেত্র চিতোরের দুর্গ-প্রাচীরের দিকে নিপতিত হইত। অমনি তিনি হৃদয়ের মুর্মুর দাহনে অধীর হইয়া পড়িতেন, যে চিতোরে বাপ্পা রাওর জীবিতকাল অতিবাহিত হইয়াছিল, যে চিতোরে রাজপুত-কুল-গৌরব সমরশী স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার্থ কাগার নদীর তীরে পৃথ্বীরাজের সহিত দেহ ত্যাগ করিতে সমর-সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছিলেন, যে চিতোরে বাদল, জয়মল ও পুত্ত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া অম্লান বদনে—অক্ষুব্ধ হৃদয়ে আত্ম-প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, অদ্য সেই চিতোর শ্মশান, অদ্য সেই চিতোরের প্রাচীর অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন ভীষণ শৈল-শ্রেণীর সাদৃশ্য বহন করিতেছে। প্রতাপ প্রায়ই এইরূপ চিন্তা—এইরূপ কল্পনায় অবসন্ন হইতেন, প্রায়ই তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে তাহার হৃদয় আলোড়িত হইত।

এইরূপ অরুন্তুদ ভাবনায় প্রতাপ তরুণ বয়সেই ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হইলেন। দুরন্ত রোগ আসিয়া শীঘ্রই তাঁহার দেহ অধিকার করিল। পেশোলা হ্রদের তীরে প্রতাপ ও তাঁহার সর্দ্দারগণ বর্ষা হইতে আপনা-দিগকে রক্ষা করিবার জন্য যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,

সেই কুটীরেই প্রতাপের জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত হয়। প্রতাপ স্বীয় তনয় ওমরার প্রতি আস্থা-শূন্য ছিলেন, তিনি জানিতেন, কুমার ওমরা নিতান্ত সুখোচিত যুবক; রাজ্য রক্ষার ক্লেশ কখনই তাহার সহনীয় হইবে না। তনয়ের এইরূপ বিলাস-প্রিয়তায় প্রতাপ নিতান্ত মর্ম্ম-ব্যথিত হইয়াছিলেন; অন্তিম সময়েও এই যাতনা তাঁহা হইতে অন্তর্হিত হইল না। আসন্ন-মৃত্যু প্রতাপের মুখ হইতে এই দুঃসহ-মনোযাতনা-সম্ভূত স্বর সমুত্থিত হইতে লাগিল। একজন সর্দ্দার এই কষ্ট দেখিয়া প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার এমন কি কষ্ট হইয়াছে যে, প্রাণবায়ু শান্তভাবে বহির্গত হইতে পারিতেছে না। প্রতাপ উত্তর করিলেন, "যাহাতে স্বদেশ তুরুকের হস্তগত না হয়, তদ্বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি জানিবার জন্য আমার প্রাণ এখনও অতি কষ্টে বিলম্ব করিতেছে।" পরিশেষে তিনি কুটীর লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "হয়ত এই কুটীরের পরিবর্ত্তে বহুমূল্য প্রাসাদ বিনির্ম্মিত হইবে, এবং আমরা মিবারের যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, হয়ত তাহা এই কুটীরের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইবে"। সর্দ্দারগণ প্রতাপের এই বাক্যে শপথ করিয়া কহিলেন, যে পর্য্যন্ত মিবার স্বাধীন না হইবে, সে পর্য্যন্ত কোনও প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে না।" প্রতাপ আশ্বস্ত হইলেন, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইল। মিবার আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে শুনিয়া তিনি শান্তভাবে ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন।

এইরূপে স্বদেশ-বৎসল প্রতাপ সিংহের জীবন-স্রোতঃ অনন্ত কাল-সাগরে বিলীন হইল। যদি মিবারে থুকিদিদিস্ অথবা জেনোফন থাকিতেন, তাহা হইলে পেলপনিসসের সমর অথবা "দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন"* কখনও এই রাজপুত-শ্রেষ্ঠের অবদান অপেক্ষা ইতিহাসে অধিকতর মধুর ভাবে কীর্ত্তিত হইত না। অনমনীয় বীরত্ব, অবিচলিত স্থিরতা, অশ্রুতপূর্ব্ব অধ্যবসায় সহকারে প্রতাপ দীর্ঘকাল প্রবল-পরাক্রান্ত, উন্নতাকাঙ্ক্ষ, সহায়-সম্পন্ন সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। এইরূপ গুণ-সদ্ভাব নিবন্ধন অদ্যাপি প্রতাপ সিংহ প্রত্যেক রাজপুতের হৃদয়ে অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। যত দিন স্বদেশ-হিতৈষণা রাজপুতের মনে অঙ্কিত থাকিবে, তত দিন প্রতাপ সিংহের এই দেব-ভাবের ব্যত্যয় হইবে না।

---

* গ্রীসের দুটী নগর স্পার্টা ও এথিন্স। এথিন্স পারস্যের সহিত যুদ্ধে বিশেষ গৌরবান্বিত হইলে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী স্পার্টা অসূয়াপরবশ হইয়া সমরসজ্জার আয়োজন করে। ইহাতে স্পার্টা ও এথিন্সের সহিত তিনটী মহাসংগ্রাম হয়। ইহাই পেলপনিসসের যুদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক থুকিদিদিস্ এই মহাসমরের সবিস্তর বিবরণ লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন।

পারস্যের রাজা দরায়ুস্ লোকান্তরগত হইলে তাঁহার পুত্র অর্ত্তক্ষত্র পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অর্ত্তক্ষত্রের ভ্রাতা সাইরস রাজ্য প্রাপ্তির জন্য দশ সহস্র গ্রীক সৈন্যের সাহায্যে সমরে প্রবৃত্ত হয়েন। খ্রীঃ পূঃ ৪০১ অব্দে সাইরস্ সমরে নিহত হইলে গ্রীক সেনাপতি জেনো-

রামায়ণের সাধারণ ধর্ম্ম ও নীতি।

অযোধ্যাধিপতি সূর্য্যবংশ-প্রভব রামচন্দ্র লঙ্কার দুর্ব্বৃত্ত অধিবাসিদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে সমূলে বিধ্বস্ত করেন, এই বিষয়ই রামায়ণের সর্ব্ব প্রধান ঘটনা। এই সামরিক ঘটনাই বাল্মীকির রসময়ী কবিতায় নিবদ্ধ হইয়া রামায়ণে উপগীত হইয়াছে। রামচন্দ্র যে সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে এই লোক-প্রসিদ্ধ অভিযানে প্রবৃত্ত হয়েন, তৎসমুদয় বিন্ধ্য পর্ব্বতের সন্নিহিত প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু রামায়ণে এই সৈন্য-ব্যূহ বানর জাতিতে পরিগণিত হইয়া বানরী বৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে। বোধ হয়, তাহারা অসভ্য-প্রকৃতি ও সংস্কৃতভাষী আর্য্য জাতির সহিত সংস্রব-শূন্য ছিল বলিয়া বাল্মীকি তাহাদিগকে এইরূপ পাশব ভাবে পরিকীর্ত্তিত করিয়াছেন। রামচন্দ্র যে জাতির বিরুদ্ধে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহারাও আকৃতি ও স্বভাব প্রভৃতিতে আর্য্যজাতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত। কিন্তু হোমার যেমন ট্রোজান-ভূমিতে গ্রীস দেশের সামাজিক

ফন তাঁহার দশ সহস্র সৈন্যের সহিত বিশিষ্ট পরাক্রম ও কৌশল সহকারে স্বদেশে প্রত্যাগত হয়েন। ইহাই "দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন" বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ গ্রীক সেনাপতি ও ইতিহাসলেখক জেনোফন ইহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখিয়াছেন।

আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্মপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, রামায়ণের কবিও সেইরূপ বিধর্ম্মীর অধ্যুষিত লঙ্কায় সংস্কৃতভাষী আর্য্যজাতির ব্যবহার ও ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকলাপ প্রবর্ত্তিত করিতে ক্রুটী করেন নাই। এইজন্যই তদানীন্তন সময়ে উপগীয়মান বেদের পবিত্র ধ্বনি ও আর্য্যজাতির অনুষ্ঠিত পবিত্র আচার-পদ্ধতিতে লঙ্কা পরিপূত ছিল। রামের এই প্রতিদ্বন্দ্বিগণ রামায়ণে রাক্ষস নামে অভিহিত হইয়াছে। রাক্ষসগণ নিরতিশয় হিংস্র, ভয়ানক ও বেদানুমোদিত ক্রিয়াকলাপের সম্পূর্ণ বিরোধী। বোধ হয়, রামায়ণের কবি স্বভাবসিদ্ধ ঘৃণার বশবর্ত্তী হইয়া এই আচার-ভ্রষ্ট জাতিকে রাক্ষসিক ভাবে চিত্রিত করিয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এইরূপে রামায়ণের মহাসমর দুটী বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন ধর্ম্মপদ্ধতির সম্প্রদায়ের বিরাট মিশ্রণে সমুদ্ভূত হইয়াছিল। ঈদৃশ বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত বিষয়-দ্বয়ের সমাবেশে উত্তম ও অধমতার চিত্র সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছে। এরূপ বিভিন্ন বর্ণের চিত্র প্রদর্শন করিয়া অপরের হৃদয়ে তাহার স্বভাব প্রতিফলিত করা বাল্মীকির প্রতিভার একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

রামায়ণের সহিত হোমারের রচিত ইলিয়াদ মহাকাব্যের অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। উভয়ই সমান ঘটনামূলক, উভয়ই ভুবন-মোহিনী কল্পনার কোমল করে সমান বিকশিত, উভয়ই প্রকৃতি-সুলভ কোমলতা, নবীকৃততা, জাতীয় কিম্বদন্তী-প্রিয়তা, সংক্ষেপতঃ আদিম অবস্থার সমুদয় কবিত্ব-সম্পত্তিতে সমান পরিস্ফুট। গ্রীক্ ও ভার-

তীয় কবিতা এইরূপ সমান গুণশালিনী হইলেও জাতিগত স্বভাব ও প্রতিভার বৈপরীত্য নিবন্ধন পরস্পর ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত। গ্রীসের স্বভাব ও প্রতিভার ফলঃ—মানবের সহিত প্রকৃতির সামঞ্জস্য, ভারতের স্বভাব ও প্রতিভার ফলঃ—মানবের সহিত প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এক দিকে এই সামঞ্জস্য আদিম গ্রীক্ মহাকাব্যে, অন্য দিকে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আদিম ভারতীয় মহাকাব্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

রামায়ণের কবিতা সাধারণতঃ অতি গম্ভীর, অতি মর্ম্ম-স্পর্শিনী ও অতি গৌরবে বিভূষিত হইলেও বর্ণনাবহুল ও অতিবিস্তৃত। ইহা অসীমতায় বিলীন হইয়াছে। হোমারের কবিতা অতি উদগ্র ও অতি সজীব হইলেও গাম্ভীর্য্য ও কমনীয়তায় সংযত। হোমারে প্রত্যেক মানবচরিত্র বিশিষ্ট সূক্ষ্মরূপে চিত্রিত হইয়াছে—তাহার ক্ষমতা ও শক্তি অতি সজীবতা সহকারে প্রতিফলিত হইয়াছে। আচার, ব্যবহারের বিষয়ে রামায়ণ অপেক্ষা হোমারের কাব্য উচ্চ সভ্যতার পরিচয়স্থল নহে। যদিও রামায়ণের যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রাদি-প্রয়োগ নিতান্ত অত্যুক্তি ও অমানুষী বিষয়ে পরিপূর্ণ; তথাপি তৎসমুদয়ে অসভ্যতা বা নির্দ্দয়তার লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। হেকতরের প্রতি একিলিসের ব্যবহারের সহিত রাবণের প্রতি রামের ব্যবহারের তুলনা করিলেই ইহা পরিস্ফুট হইবে। একিলিস্ পতিত শত্রুর প্রতি নির্দ্দয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, রাম পতিত শত্রুর প্রতি সৌজন্যের একশেষ দেখাইয়াছেন। এইরূপ উদারতাগুণে

বাল্মীকির রামায়ণ হোমারের ইলিয়াদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুখ-সমৃদ্ধির বর্ণনাতেও রামায়ণ ইলিয়াদের নিম্নগণ্য নয়। বাল্মীকির অযোধ্যা ও লঙ্কা হোমারের স্পার্টা ও ট্রয় অপেক্ষা অনেক অংশে ভোগ-বিলাস ও সৌভাগ্য-সম্পদের আশ্রয়-ক্ষেত্র।

ভাষা বিষয়ে গ্রীক্ ও ভারতীয় মহাকাব্য উভয়ই সরল, স্বাভাবিকও কষ্টকল্পনার বহির্ভূত। কিন্তু বাল্মীকির ভাষা-সম্বন্ধিনী রীতি হোমার অপেক্ষা অটল ও সুব্যবস্থিত। যাহা হউক, সংক্ষেপতঃ রামায়ণ ও হোমারের মহাকাব্য দুটী বিভিন্ন জাতির প্রতিভাশালী কবির দুটী অতি মহৎ কীর্ত্তি-স্তম্ভ। শেষটী প্রকৃতির সহিত অতিসমঞ্জসীভূত ও শিল্প-কুশলা কল্পনার তুলিকায় অতিচিত্রিত, প্রথমটী প্রতিভার উচ্চভাবে অতিবিস্তৃত ও অতি গৌরবান্বিত। শেষটী রণ-স্থলবর্ত্তিনী সংহার-মূর্ত্তির ন্যায় বিরাট ভাবে অবস্থান করিতেছে, প্রথমটী নিরীহ-স্বভাব সংযতমনা তপস্বিশ্রেষ্ঠের ন্যায় পবিত্র ভাবে ভাসমান রহিয়াছে।

এই রামায়ণরূপ সপ্তকাণ্ড কল্পপাদপে নানা নীতি-বিষয়িণী কথা বর্ণিত আছে। লঙ্কাদ্বীপে রাবণ অতিশয় দুরাচার ছিল। সে বল পূর্ব্বক পরদার হরণ করিয়া আনিত। পরিশেষে সীতা হরণ করাতে তাহাকে যে প্রকার দুরবস্থান্বিত ও অপমানিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তাহা ইহাতে সবিস্তর বর্ণিত আছে। সুতরাং তৎপাঠে রাবণের ব্যবহারের প্রতি সকলেরই ঘৃণা জন্মে। পক্ষান্তরে রাম অতি সদাশয় ছিলেন; রামায়ণে যেরূপ বর্ণিত আছে তাহাতে বোধ হয়, ধৈর্য্য, বিনয়, গাম্ভীর্য্য, সরলতা, দাক্ষিণ্য

প্রভৃতি সদ্‌গুণ যেন মূর্ত্তিমান হইয়া রাম রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। রামচন্দ্র অনেক বার নানা বিপদে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি বিচলিত হন নাই। তাঁহার বদনমণ্ডলে নিরবচ্ছিন্ন ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিত। সত্যসন্ধ রামচন্দ্র পিতৃপরায়ণ ছিলেন। তিনি একমাত্র পিতৃ সত্য-রক্ষার্থ অনায়াসে রাজ্য-সুখ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বর্ষকাল বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অসাধারণ পিতৃ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। দুরাত্মা রাবণ সীতারে হরণ করিয়া লইয়া গেলে, রামচন্দ্র বানর-বল সহকারে লঙ্কা অবরোধ করিয়াছিলেন, তথাপি সত্য-লঙ্ঘন ও রাজ্যের অনিষ্টাশঙ্কা ভয়ে অযোধ্যায় গমন করিয়া অনুজ ভরতের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। রাম প্রিয়তমার উদ্ধার সাধন করিয়া নিয়মিত চতুর্দ্দশ বর্ষান্তে অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক রাজ্য-ভার গ্রহণ করিয়া বিলক্ষণ সুনিয়ম সহকারে প্রজা-পালন করিয়াছিলেন। বনে গমন সময়ে জটা-চীর ধারণ করিতে রামের যে প্রকার বিনয়-চিহ্ন-সুশোভিত মুখকান্তি দৃষ্ট হইয়াছিল, রাজাসন-গ্রহণ সময়ে মহার্হ রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিতে তাহার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। রাম-চন্দ্র বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অনেক সময়ে দুর্ব্বিসহ দুঃখা-নলে দগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজ্য-ভার গ্রহণ করিয়া তদ্দুঃখের নিদানভুতা জননী কৈকেয়ীর প্রতি কিছু মাত্র অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই, প্রত্যুত অনুক্ষণ দৃঢ়তর ভক্তি সহকারে তাঁহার সেবা, শুশ্রূষা করিতেন। পরিশেষে রামচন্দ্র এক মাত্র প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত প্রীতির প্রতিমা

প্রিয়তমাকে নিতান্ত নিরপরাধা জানিয়াও অনয়াসে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

রামায়ণ-পাঠে পাতিব্রত্য-বিষয়িণী নীতিও লাভ করিতে পারা যায়। জনক-নন্দিনী সীতা অতিশয় পতিপরায়ণা ছিলেন। বোধ হয়, জগদীশ্বর জগল্লোককে পতিভক্তি বিষয়ক উপদেশ দিবার নিমিত্ত সীতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সীতা, সাক্ষাৎ প্রজাপতি-সদৃশ জনক এবং সর্ব্বগুণান্বিত ও সর্ব্বপ্রকার ধন-সম্পত্তির অধিপতি পতি লাভ করিয়া এরূপ চিরদুঃখিনী ছিলেন যে, ভূমণ্ডলে অন্য কোন রমণী তাদৃশ সুভগকুলের বধূ হইয়া, তাঁহার ন্যায় দুরবস্থান্বিতা হয়েন নাই। সুকুমারাঙ্গী জানকী একমাত্র ভর্ত্তার মুখ দেখিয়াই সুকঠোর বনবাস-দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন। অনন্তর দুর্ম্মতি রাবণ কর্ত্তৃক হৃতা হইয়া লঙ্কায় অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করেন, তথাপি অমূল্য সতীত্ব-রত্ন বিনষ্ট করেন নাই। পরিশেষে রাবণ নিহত হইলে রামচন্দ্র অগ্নি-পরীক্ষা পূর্ব্বক সীতারে গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় আগমন করেন। এমন সময়েও নির্দ্দয় দৈব প্রতিকুল হইয়া চিরদুঃখিনী সীতার সুখরত্ন অপহরণ করে। রামচন্দ্র দুর্ন্নিবার লোক-গঞ্জনা সহিতে না পারিয়া তাদৃশ পতি-পরায়ণা কামিনীকে অরণ্যে নির্ব্বাসিত করেন। ইহাতেও সীতা ভ্রমক্রমে ভর্ত্তা কিম্বা দেবরগণের নিন্দাবাদ করেন নাই, প্রত্যুত আপনাকেই চিরদুঃখিনী ও হতভাগিনী বলিয়া বারম্বার ধিক্কার দিয়াছিলেন। সীতা একান্ত পতিপ্রাণা ও সরল-হৃদয়া ছিলেন। তাঁহার ন্যায় শুদ্ধাচারিণী কামিনী ভূমণ্ডলে

প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। নির্ম্মল পবিত্রভাব ও অলৌকিক মহত্ত্বচ্ছটা তাঁহার বদন-মণ্ডলে নিরন্তর বিরাজমান থাকিত। সীতা, তাদৃশ সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তী পতি পাইয়াও চিরজীবনের মত বন-বাসিনী হইয়া যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূল দ্বারা অতিকষ্টে জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্য-সুখভোগ প্রার্থনা করেন নাই, কেবল পতি সুখেই সুখী ও পতি দুঃখেই দুখী ছিলেন। সীতা, শ্বশ্রূগণের প্রতি কখনও অভক্তি প্রকাশ করেন নাই, প্রত্যুত নিরন্তর তাহাদিগের শুশ্রূষা করিয়া আশীর্ব্বাদ-পাত্রী হইয়াছিলেন। এরূপ ললনার ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে কাহার হৃদয় বিগলিত না হয়? এবং কোন্ সামাজিকের মনেই বা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-মিশ্র শোক-ভাবের উদয় না হইয়া থাকে? সীতার ন্যায় সেই পবিত্র ভাব—সেই পতি-পরায়ণতা—সেই উদারতা লাভ করিতে চেষ্টা করা অস্মৎ-কামিনীকুলের একান্ত বিধেয় এবং তজ্জন্য রামায়ণান্তর্গত সীতা-চরিত অধ্যয়ন করা তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

রামায়ণে অসাধারণ ভ্রাতৃপ্রেম, অসাধারণ সুহৃৎ-প্রণয় ও অসাধারণ প্রভু-ভক্তির বিষয় সবিস্তর বর্ণিত আছে। সুশীল ভরত পিতৃ-দত্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও কেবল প্রগাঢ় ভ্রাতৃ-প্রেম নিবন্ধন তাহা গ্রহণ করেন নাই। প্রত্যুত অগ্রজের পাদুকাকেই রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়াছিলেন। ভরত অগ্রজ রামচন্দ্রকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। প্রাণান্তেও অগ্রজের অপ্রিয় কার্য্য সাধন করেন নাই। তিনি মাতুলালয় হইতে আসিয়া সৈন্য-সামন্ত-সমভি-

ব্যাহারে অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অগ্রজকে পুনরানয়ন করিতে বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এইরূপ লক্ষ্মণও রামচন্দ্রের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিমান্ ছিলেন। তিনি অগ্রজের প্রতি অনুরাগ বশতঃ স্বল্পবয়সে অনায়াসে রাজ্য-সুখ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বনে বনে বেড়াইয়া তদীয় প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। দারুণ শক্তিশেল-বেদনা সহ্য করিয়াও বিপুল পরাক্রম সহকারে ভ্রাতৃজায়ার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ অগ্রজের আজ্ঞা কখনও অবহেলা করেন নাই। তিনি ভ্রাতৃআজ্ঞায় নিতান্ত নির্দ্দয়ের ন্যায় গর্ভবতী ভ্রাতৃ-বধূকে অরণ্যে পরিত্যাগ করেন।

সুগ্রীব ও বিভীষণ অসাধারণ সুহৃৎ-প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিপৎকালে বন্ধুকে পরিত্যাগ না করিয়া কিরূপে তাহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হয়, উক্ত মহাত্মদ্বয়ই তাহার এক শেষ করিয়াছেন। সুগ্রীব প্রিয়তম মিত্রের সাহায্যার্থ সসৈন্যে লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে বিপুল কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন। এইরূপ পবন-তনয় হনুমানও অসামান্য প্রভুভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। শত যোজন-বিস্তীর্ণ জলধি উত্তীর্ণ হইয়া জনক-তনয়ার অন্বেষণ, সেতুবন্ধে কষ্ট স্বীকার, গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে বিশল্যকরণী আনয়ন পূর্ব্বক লক্ষ্মণের জীবন দান প্রভৃতি প্রত্যেক কার্য্যে তাহার অসাধারণ প্রভু-ভক্তির নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিপৎসময়ে প্রভুর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন কিম্বা তাঁহাকে পরিত্যাগ না করিয়া কিরূপে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হয়, হনুমানই তদ্বিষয়ের আদর্শ-

ভূমি। রামায়ণে এতাদৃশ মহাত্মগণের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তদনুরূপ আচরণ করিতে বলবতী প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। কিন্তু বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুগ্রীব ও বিভীষণের সমুদয় কার্য্য সন্নীতির অনুমোদিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না।

রামায়ণে পূর্ব্বতন মহর্ষিগণের বিনয়, সরলতা, সত্য নিষ্ঠা, বিদ্যাপরায়ণতা প্রভৃতির বিষয় পাঠ করিলে চিত্তের উদারতা সাধিত হয়। পরন্তু বহু বিবাহ করিলে যেরূপ পারিবারিক অনিষ্ট হয়, প্রকৃষ্ট পদ্ধতি-ক্রমে যেরূপে প্রজারঞ্জন করিতে হয়, তাহা ইহাতে বর্ণিত আছে। সুতরাং তৎপাঠে অনেক নৈতিক উপদেশ লাভ করিতে পারা যায়।

সংযুক্তা * ।

ভারতবর্ষ সুবিস্তীর্ণ পৃথিবীর মানচিত্রের একটী ক্ষুদ্রতর অংশ মাত্র। কিন্তু এই ক্ষুদ্রতর অংশ পবিত্র ইতিহাসের অতি আদরের ধন। অভ্যতার প্রথম প্রবর্ত্তক আর্য্য মনীষিগণের গভীর মস্তিষ্ক-সমুত্থিত বেদ, দর্শন, বিজ্ঞান সাহিত্য প্রভৃতি এক সময়ে এই অংশেই সমুদিত হইয়াছিল। ইউরোপের, গ্রীস্, আফ্রিকার মিশর যদি কবি ও ঐতিহাসিকগণের হৃদয়গত শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি পাইবার যোগ্য হয়, তাহা হইলে আসিয়ার এই ভারতবর্ষও সেই শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলির সম্যক্ অধিকারী। বস্তুতঃ ভারত চির দিনই সকলের প্রীতির পুত্তলী। কল্পনা যাঁহার নর্ম্মসখী, ললিত-পদাবলি যাঁহার জীবন-সহচরী, শব্দ-চাতুরী যাঁহার বিশ্বস্ত পরিচারিকা, ভাবঘটা যাঁহার ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী, ভারত সেই স্বভাব-প্রিয় অন্তস্তত্ত্বজ্ঞ কবির উপাস্য দেবতা স্বরূপ। আবার সত্য যাঁহার হৃদয়-সখা, ন্যায় যাঁহার মন্ত্র-দাতা, সমবেদনা যাঁহার জীবন-তোষিণী, ভারত সেই অপক্ষ-পাতী সহানুভূতিপর ঐতিহাসিকের অতি আদরের সামগ্রী। কবির রসময়ী কবিতায়, ঐতিহাসিকের সারল্যময়ী বর্ণনায়

---

* কেহ কেহ ইঁহাকে "সংজ্ঞোগতা" নামে নির্দ্দেশ করেন। পরন্তু রাজা বলিতে ইঁহার নাম "অনঙ্গমঞ্জরী" লিখিত আছে।

ভারতের গৌরব, ভারতের বীরত্ব, ভারতের বৈভব অনন্ত কাল লীলা করিবার যোগ্য। যাঁহারা বিষয়-নিস্পৃহ, ভোগ-সুখে বিরত, সর্ব্ব প্রকার উদাসীনতা সর্ব্ব প্রকার নিবৃত্তি যাঁহাদের জীবনের অবলম্বন, যাঁহারা "নলিনীদলগত"-জলের ন্যায় জীবনের ক্ষণস্থায়িতা, বিদ্যুৎ-প্রভাব ন্যায় সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর চঞ্চলতা, চক্রনেমির ন্যায় অদৃষ্টের পরিবর্ত্তনশীলতা দেখিয়া সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হয়েন, নির্জ্জন গিরি-কন্দরে—নির্জ্জন অরণ্যে নীরবে বসিয়া অন্তিমে অনন্ত শক্তির ধ্যানে নিবিষ্ট-চিত্ত থাকেন, ভারত সেই যোগরত তাপসগণের যোগাভ্যাসের প্রবর্ত্তক। তাঁহারা সৌভাগ্য-লীলা-তরঙ্গায়িত ভারতের ইদানীন্তন শ্মশান ভাব, হিন্দু রাজ-চক্রবর্ত্তিগণের উত্থান ও পতন, মুসলমান সম্রাট্‌গণের উদয় ও বিলয় ভাবিয়া সংসারের অসারতা, অদৃষ্টের চঞ্চলতা অনুভব করিবেন এবং ক্ষণস্ফূর্ত্তি-শীল জলবিম্ব জলে মিশাইতে দেখিয়া প্রবৃত্তির অনুরাগ, মায়ার কুহকে আকৃষ্ট না হইয়া গম্ভীর ভাবে যোগাসনে সমাসীন থাকিবেন। এইরূপ এক সময়ে সৌভাগ্য-লীলা-তরঙ্গায়িত, সুখ-বল্লীর-বিলাস ভুমি, অন্য সময়ে বিকট শ্মশানের বিকট মূর্ত্তির উদ্দীপক ভারতের বিষয় লইয়া অনেকেই অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রামায়ণকার বাল্মীকি—মহাভারতকার বেদ-ব্যাস হইতে ইদানীন্তন ক্ষুদ্রতম গ্রন্থকার পর্য্যন্ত সকলেরই ভারতীয় বিষয় লেখনীর প্রধান উপজীব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতীয় মনস্বিগণের সকলেই সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ভারতীয় বীরেন্দ্রগণের সকলেই দেশ-হিতৈষিদিগের পূজনীয়।

ইঁহাদের সকলের বিষয়ই পবিত্র ইতিহাসের বরণীয় হইয়া লোকের রসনায় রসনায় লীলা করিয়া বেড়াইতেছে। উজ্জয়িনী-জনিতা কবিতা-বল্লীর মধুময় কুসুম পৃথিবীর প্রতি সভ্য গৃহেই আদরসহকারে পরিরক্ষিত হইতেছে, গভীর জ্ঞান—গভীর চিন্তার পরিচায়ক ষড় দর্শন পৃথিবীর প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণেরই উপাস্য দেবতা-স্থানীয় হইয়া রহিয়াছে, প্রাচীনতম শ্রুতি ও স্মৃতির নিকট পৃথিবীর প্রতি সভ্য জনপদই ভক্তিভাবে মস্তক অবনত করিতেছে। বাপ্পা ও পুত্তের নাম সকলের মুখেই ধ্বনিত হইতেছে; প্রতাপ সিংহ, ও গোবিন্দ সিংহ সকলের নিকটেই হৃদয়গত শ্রদ্ধা পাইতেছেন; শিবজী ও সের সিংহ ভারতের সমস্ত ইতিহাসেই স্তুত হইতেছেন। এইরূপ ভারতীয় কীর্ত্তির নিদানভূত ভারতীয় আর্য্যগণ পৃথিবীর সমস্ত সভ্যমণ্ডলীতেই সম্মানিত ও সমাদৃত হইয়াছেন।

ভারতীয় পুরুষগণের ন্যায় ভারতীয় রমণীকুলও এক সময়ে ধৈর্য্যে অটল ছিলেন, বীরত্বে অজেয় ছিলেন, জাতীয় জীবনে অনমনীয় ছিলেন। তাঁহারা কেবল কোমল প্রকৃতির কোমল সৌন্দর্য্যের সম্ভোগেই ব্যাসক্ত ছিলেন না—ভ্রমর-চুম্বিত প্রভাত-কমলের অঙ্গ-বিলাস অথবা দিবস-পরিণাম-সম্ভূত সায়ন্তন শ্রীর কমনীয় শোভা প্রভৃতিতেই কেবল অনিমিষ-লোচন হইয়া থাকিতেন না। মলয় সমীরণ প্রসুন-লতিকা দোলাইয়া স্পর্শে স্পর্শে দেহ-যষ্টি আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে জাড্য-দোষে সমাচ্ছন্ন করিতে সমর্থ হইত না। ভোগ-সুখের আবেশময়ী ললিত কবিতাবলি

তাঁহাদের চিত্ত-বিনোদনের সামগ্রী ছিল না। তাঁহারা লোকারণ্যে জীবসমূহের বিরাট মিশ্রণ-জনিত ভীমকান্ত সৌন্দর্য্যে সমাকৃষ্ট হইতেন, তাঁহারা গগণস্পর্শী হিমগিরির কটিতে প্রলয়-পয়োদ-মালার ছুটাছুটি দেখিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতেন, তাঁহারা ভীম-মারুত-সংক্ষোভিত বিশাল অপার সিন্ধুর বিশ্বত্রাস গর্জ্জনে উৎফুল্ল হইতেন, তাঁহারা পর্ব্বত-বিদারী বাক্যাবলিতে নাচিয়া উঠিতেন। তাঁহাদের হৃদয়সাগর অটলতা, নির্ভীকতায় আতটপূর্ণ ছিল, তাঁহাদের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি সুখে দুঃখে, সুসময়ে দুঃসময়ে, অভ্রংলিহ গিরি-বরের ন্যায় সদা উন্নতশীর্ষ থাকিত। ভারতভূমি এক সময়ে এইরূপ মহিলাকুলের বিলাসক্ষেত্র ছিল, এক সময়ে এইরূপ মহিলাকুলের গৌরবে ভারতভূমি গৌরবিনী হইয়া সহৃদয় কবি—সহৃদয় ঐতিহাসিকের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিরাছিল।

সংযুক্তা এই শ্রেণীর রমণীকুলের মধ্যে পরিগণিত। ইনি কান্যকুব্জপতি জয়চন্দ্রের দুহিতা। ১১৭০ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। সুপ্রসিদ্ধ চাঁদ কবি চৌহান রাসোর কানোজখণ্ডে ইঁহার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। সংযুক্তা তাৎকালিক মহিলা-দিগের আদর্শ-ভূমি ছিলেন। তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্য কেবল দেহযষ্টিতেই পর্য্যবসিত হয় নাই, উহা আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিতেও উপগত হইয়া চিত্তের উদারতা সাধন করিয়া-ছিল। সংযুক্তার গুণগরিমা এতদূর লব্ধপ্রসর হইয়াছিল যে, চাঁদ তাঁহাকে কান্যকুব্জের লক্ষ্মী বলিয়া বর্ণনা করিতে ত্রুটী করেন নাই।

জয়চন্দ্র রাঠোর-বংশীয় রাজপুতদিগের এবং সুপ্রসিদ্ধ দিল্লীপতি পৃথ্বীরাজ চৌহান-বংশীয় রাজপুতদিগের শিরঃস্থানীয় ছিলেন। এই রাঠোর ও চৌহান কুলের মধ্যে মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ-ভাব ছিল। পৃথ্বীরাজ অতুল সৌভাগ্য-সম্পত্তির ক্রোড়ে লালিত হইয়া একদা সুপ্রসিদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই মহাযজ্ঞের মহদনুষ্ঠান দেখিয়া তদীয় পরম শত্রু জয়চন্দ্রের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয়। জয়চন্দ্র এতন্নিবন্ধন অমর্ষ-প্রদীপ্ত হইয়া স্বীয় গৌরব ও প্রাধান্য অপ্রতিহত করিবার জন্য অচিরাৎ রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন। এই শেষবার ক্ষত্রিয়-রাজধানীতে ক্ষত্রিয় রাজগণের অভীষ্ট মহাযজ্ঞ সম্পাদিত হয়। ভারতীয় রাজন্যশ্রেষ্ঠের মধ্যে সকলেই এই মহাযজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া কান্যকুব্জে আগমন করেন। কেবল দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ ও মিবারাধিপতি সমরশীর আগমন হয় না। ইঁহারা আপনাদের বর্ত্তমানে জয়চন্দ্রকে তথাবিধ মহাযজ্ঞ সম্পাদনের অযোগ্য বলিয়া নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেন। জয়চন্দ্র এতন্নিবন্ধন অভিমান-স্ফীত হইয়া পৃথ্বীরাজ ও সমরশীর দুটী হিরণ্ময়ীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যথাক্রমে দ্বারবান্ ও স্থালী-পরিষ্কারকের পদে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। এদিকে মহদাড়ম্বরসহকারে রাজসূয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। যজ্ঞান্তে কান্যকুব্জ-লক্ষ্মী সংযুক্তার স্বয়ম্বরের উদ্যোগ হইতে থাকে। স্বয়ম্বর-প্রথা রমণীকুলের মনোমত বর নির্ব্বাচনের উৎকৃষ্ট সাধন। ভারত যখন উন্নতির শিখরে সমারূঢ়, ভারতীয় রীতি, ভারতীয় আচার যখন অপরাপর জাতির অনুকরণীয়, তখন

এই স্বয়ম্বর-প্রথা ভারতের সমাজে বদ্ধমূল হয়, তখন এই স্বয়ম্বর সকলের সর্ব্বপ্রকার গুণ-গ্রামের অদ্বিতীয় পরিচয়-স্থল হইয়া উঠে। প্রস্তাবিত সময়ে যদিও ভারতের সুখ-শশী ক্রমশঃ অস্তগমনোন্মুখ হইতেছিল, যদিও ভারতের অতুলনীয় মহিমা ক্রমশঃ এক এক গ্রাম নিম্নগত হইতেছিল, তথাপি আর্য্য সমাজ এই চিরন্তন পদ্ধতির বহিশ্চর হয় নাই। এই পদ্ধতির অনুবর্ত্তী হইয়া অদ্য গুণ-গৌরব-শ্রেষ্ঠ বাহুবল-দৃপ্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ একে একে কান্যকুব্জের স্বয়ম্বর-সভা সমলঙ্কৃত করিতে লাগিলেন। রাজগণের অধিবেশনের পর লোক-ললামভূতা সংযুক্তা স্বয়ম্বরোচিত বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া হস্তে বরমালা ধারণ পূর্ব্বক ধাত্রী সমভিব্যাহারে সভা-গৃহে সমাগত হইলেন।

যে গুণানুরাগ হৃদয়ের স্তরে স্তরে উদ্দীপ্ত হইয়া মানবী প্রকৃতি দেবভাবান্বিত করিয়া তুলে, তাহা কখনও সামান্য বাহ্য আবরণে নিবারিত হয় না। সংযুক্তা ইহার পূর্ব্বেই পৃথ্বীরাজের অলোকসামান্য গুণ—অলোকসামান্য সাহস—অলোকসামান্য বীরত্বের বিবরণ শুনিয়া তৎপ্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে পিতার শত্রুতায় সে আসক্তি নিরাকৃত হইল না। তিনি ক্ষত্রিয়োচিত সাহস অবলম্বন করিয়া পৃথ্বীরাজকেই বরমাল্য দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সুশোভন সভামণ্ডপস্থ সুসজ্জিত রাজন্যকুলের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল না। সংযুক্তা সকলকে অতিক্রম করিয়া পৃথ্বীরাজের দ্বারবান্‌স্থানীয় হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির গলদেশে বরমাল্য সমর্পণ করিলেন। জয়চন্দ্র দুহিতার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব

কার্য্যে ম্রিয়মান হইলেন, স্বয়ম্বরস্থলীর রাজগণ তাদৃশ রূপ-গুণ-সম্পন্ন ললনারত্ন লাভে হতাশ হইয়া আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

অচিরাৎ সংযুক্তার মাল্যার্পণ-সম্বাদ দিল্লীশ্বরের শ্রুতি-প্রবিষ্ট হইল। সম্বাদ পাইবামাত্র তিনি সসৈন্যে কান্যকুব্জে আসিয়া সংযুক্তাকে পিতৃভবন হইতে হরণ করিলেন। জয়চন্দ্র কন্যারত্নের উদ্ধারার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা পাইলেন, কান্যকুব্জ হইতে দিল্লীর গন্তব্য পথে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। কিন্তু পরিশেষে বিজয়শ্রী পৃথ্বীরাজের পক্ষাশ্রয়িনী হইলেন। জয়চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষুব্ধ হৃদয়ে কান্যকুব্জে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল।

কেহ কেহ পৃথ্বীরাজ-কৃত সংযুক্তা-হরণ ঘটনা ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নিবেশিত করিয়াছেন। আবার কাহারও মতে ইহা উক্ত সময়ের পঞ্চদশ বৎসর পরে সংঘটিত হইয়াছিল*। যাহা হউক, পৃথ্বীরাজ এই অসাধারণ ললনারত্নের অধিকারী হইয়া অনুক্ষণ তদ্গতচিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন, সংযুক্তার অসাধারণ গুণে দেববাঞ্ছনীয় স্বর্গ-সুখও তাঁহার নিকট তুচ্ছ বোধ হইল। সংযুক্তা অল্প সময়ের মধ্যেই পটীয়সী নর্ম্ম-সখীর ন্যায় ভর্ত্তার এইরূপ জীবন-সহচরী হইয়া উঠিলেন।

---

* আমাদের বিবেচনায় এই শেষোক্ত (১১৯০ খ্রীঃ অব্দ) সময়ই ঠিক। ১১৭০ খ্রীঃ অব্দে যখন সংযুক্তার জন্ম, তখন ১১৭৫ অব্দে কি প্রকারে তিনি স্বয়ম্বরা হইবেন? পঞ্চবর্ষীয়া বালিকা কখনও স্বয়ং পতি মনোনীত করিতে পারে না।

পৃথ্বীরাজ যখন এইরূপ অনন্যসাধারণ দাম্পত্য-প্রেমের ক্রোড়ে লালিত, সংযুক্তা যখন এইরূপ পতি-সোহাগিনী হইয়া সৌভাগ্য-দোলায় দোলায়মান, তখন দুরন্ত সাহেবুদ্দীন ঘোরী উৎপাতকেতু স্বরূপ হইয়া ভারতের দ্বারে উপস্থিত হইল। সংযুক্তা, আসন্ন শত্রুর ভীষণ কবল হইতে মাতৃভূমি রক্ষা করিতে যত্নপর হইলেন। কিরূপে যবন সৈন্য বিধ্বস্ত হইবে, কিরূপ যবন-গ্রাস হইতে ভারতভুমি রক্ষা পাইবে, এই চিন্তাই এক্ষণে তাঁহার অন্তরের প্রতি স্তরে বিরাজ করিতে লাগিল। তিনি ভর্ত্তাকে চতুরঙ্গ সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া শীঘ্রই রণক্ষেত্রে অবতরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সংযুক্তার যত্ন, কেবল এই অনুরোধ মাত্রেই পর্য্যবসিত হইল না। তিনি সমস্ত যুদ্ধোপকরণ একত্র করিয়া গম্ভীরোন্নতস্বরে পৃথ্বীরাজকে কহিলেন:—"জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। আমরা অদ্য যে জীবনস্রোতে গা ঢালিয়া পার্থিব সুখ উপভোগ করিতেছি, হয়ত কল্যই তাহা অনন্ত সাগরে বিলীন হইতে পারে। ঈদৃশ ক্ষণভঙ্গুর দেহের মমতায় আকৃষ্ট হইয়া যশের অনন্ত সুখে জলাঞ্জলি দেওয়া বিধেয় নহে। যিনি মহৎ কার্য্য সাধন করিতে গিয়া আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তিনি অনন্তকাল ইহ জগতে বর্ত্তমান থাকেন। আমি আশা করি, তুমি নিজের বিষয় না ভাবিয়া অমরতার দিকে মনোযোগী হইবে। তোমার করস্থিত শাণিত অসি শত্রুর দেহ দ্বিখণ্ড করুক, তোমার অধিষ্ঠিত তেজস্বী অশ্ব শত্রুর অনন্তপ্রবাহ শোণিত-স্রোতে সন্তরণ করুক, তোমার চতুরঙ্গ সৈন্যদল "হর হর" ধ্বনিতে

চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত করুক। এই মহৎ কার্য্যে মৃত্যুকে ভয় করিও না, রণস্থল-বর্ত্তিনী করাল সংহার-মূর্ত্তি দেখিয়া দিশাহারা ও কর্ত্তব্যবিমুখ হইও না। সাহস, উদ্যম ও যত্ন সহকারে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা কর, আমি পরলোকে তোমার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইব।" বীরবালা বীরজায়ার মুখ হইতে এইরূপ তেজস্বি বাক্য বহির্গত হইয়াছিল, এইরূপ তেজস্বিতা পৃথ্বীরাজের হৃদয়ে অনুপ্রবেশিত হইয়া তাঁহাকে দ্বিগুণতর উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল।

অবিলম্বে সৈন্যগণ সমবেত হইয়া যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল। ভারতের প্রায় সমস্ত ক্ষত্র বীরগণই এই মহাযুদ্ধে শরীর ও মন উৎসর্গ করিলেন। আর্য্যবর্ত্তের রাজন্য-কুলের বিশ্বত্রাস "হর হর" ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক বিকম্পিত হইতে লাগিল। হিন্দুকুল-চক্রবর্ত্তী পৃথ্বীরাজ এই বৈজয়ন্তী সেনার অধিনায়ক হইয়া সাহেবুদ্দীনকে সমরে আহ্বান করিলেন। উত্তর ভারতের তিরোরী-ক্ষেত্রে উভয় পক্ষে মহাসংগ্রাম হইল। যবন সৈন্য ক্ষত্রিয় বীরগণের দুর্ব্বার পরাক্রমে ইতস্ততঃ পলায়িত হইতে লাগিল। শত্রুর পতাকা, শত্রুর অস্ত্র পৃথ্বীরাজের করগত হইল। সাহবুদ্দীন ঘোরী পরাজিত ও হত-সর্ব্বস্ব হইয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিল। পৃথ্বীরাজ বিজয়-বৈজয়ন্তীতে পবিশোভিত ও বিজয়-লক্ষ্মীর ক্রোড়ে সম্বর্দ্ধিত হইয়া মহোল্লাসে দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ভারতের এইরূপ গৌরব এক্ষণে বিগত সময়ের সহিত বিলীন হইয়াছে। সে সাহস, সে বীর্য্যবত্তা, সে রণোন্মাদ এক্ষণে কেবল আভিধানিক শব্দে পরিণত হইয়াছে। যে

তিরোরীতে আর্য্যকুল-ধুরন্ধর পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরীকে পরাজিত করিয়াছিলেন, সে তিরোরী আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে, সে আর্য্যাবর্ত্ত একদা বিজয়-ভেরী, বিজয়-দুন্দুভির গভীর শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, সে আর্য্যাবর্ত্ত আজও ভারত-মানচিত্রে শোভা পাইতেছে, কিন্তু অদ্য তিরোরীর সে গগনস্পর্শী "হর হর" ধ্বনি নাই, অদ্য আর্য্যাবর্ত্তের সে একতা, সে আত্ম-ত্যাগ সে বিজয়োল্লাস নাই। অদ্য ভারত শ্মশান। সমীরণ দুঃখে বিলাপ করিয়া বহিয়া যাইতেছে, পবিত্র তরঙ্গিণী বিষাদ-তরঙ্গে এক বার উন্নত আবার অবনত হইতেছে, অদ্য ভারত শ্মশান। অদ্য বিংশতি কোটী জীব এই মহাশ্মশানে মহানিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে।

যে দিন পৃথ্বীরাজ রণ-বিজয়ী হইয়া মহোৎসব-সহকারে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশ করেন। সে দিন ভারতের কি শুভ দিন! ভারত সেই দিনই প্রকৃত জীবনী-শক্তি-সম্পন্ন হয়—ভারত সেই দিন প্রকৃত জাতীয় জীবনের মহিমায় মহীয়ান্ হইয়া উঠে। "ইচ্ছা হয়, সেই শুভদিনে সমর-বিজয়ীর আগমন-পথের উভয় পার্শ্বে কদলী বৃক্ষতলে আম্রপল্লব-সমন্বিত সলিলপূর্ণ কলসাবলি স্থাপন করিয়া রাখি, ইচ্ছা হয়, সেই শুভ দিনে সেই আর্য্যকুল-রবির প্রত্যুদ্গমন করিয়া জীবন চরিতার্থ করি। হায়! আমরা কি অসম্বন্ধ প্রলাপের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তখন আমরা কোথায়?" তখন আমরা ভবিষ্যকাল-গর্ভে নিহিত থাকিয়া ভবিষ্য জগতের ক্রীড়নক স্বরূপ রক্ষিত হইয়াছিলাম। এক্ষণে

দুরন্ত হৃদয়াবেগ-জনিত এই অসম্বদ্ধ প্রলাপের অনুবর্ত্তী না হইয়া প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

পরাজিত হইবার দুই বৎসর পরে সাহেবুদ্দীন আবার দলবলসহকারে ভারতবর্ষে উপনীত হইল। এ বারেও পৃথ্বীরাজ যুদ্ধার্থ সুসম্বদ্ধ আয়োজনে তৎপর হইলেন। অবিলম্বে সমর-সংক্রান্ত সভা সংগঠিত হইল, নানা স্থান হইতে সৈন্যগণ সমবেত হইতে লাগিল, ক্ষত্রিয় রাজগণ একে একে আসিয়া অধিনায়কের সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিনের মধ্যেই দিল্লীতে পুনর্ব্বার বিশাল সৈন্য-সাগরের আবির্ভাব হইল।

যুদ্ধ-যাত্রীর সকলেই স্বস্ব পরিবার-বর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। মাতা, দুহিতা, স্ত্রী, সকলেই তাহাদিগকে "রণে ভঙ্গ দেওয়া অপেক্ষা রণ-ভূমিতে দেহ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ" বলিয়া বিদায় দিল। এদিকে সংযুক্তা ভর্ত্তাকে বীর-সাজে সাজাইলেন, সাজাইতে সাজাইতে তাঁহার হৃদয় হঠাৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। হঠাৎ দক্ষিণ নেত্র স্পন্দিত হইতে লাগিল। সংযুক্তা অনিমিষ লোচনে পৃথ্বীরাজের দিকে চাহিলেন, অতর্কিতভাবে কয়েকটী মুক্তা-ফল কপোল বহিয়া বক্ষে পতিত হইল। পৃথ্বীরাজ কাল-বিলম্ব না করিয়া সৈন্যদল-সমভিব্যাহারে নগর হইতে বাহির হইলেন। সংযুক্তা ভর্ত্তার গমন-পথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস-সহকারে কহিলেন, "স্বর্গ ব্যতিরিক্ত বোধ হয় আর এই যোগিনীপুরে (দিল্লীতে) দয়িতের সহিত সম্মিলন হইবে না।"

সৌভাগ্য-লক্ষ্মী চির দিন এক জনের পক্ষে থাকেন না—চির দিন কাহারও সমান যায় না। অদৃষ্ট চক্রনেমির ন্যায় একবার ঊর্দ্ধ পুনর্ব্বার অধোগামী হইয়া ইহলোকে সংসারের চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিতেছে। পৃথ্বীরাজ তিরোরী-ক্ষেত্রে যে বিজয়-বৈজয়ন্তীতে পরিশোভিত হইয়াছিলেন, মুসলমান-দিগের চাতুরী ও কালের নিয়তিবলে দ্বিতীয় যুদ্ধে তাহা বিচ্যুত হইয়া পড়ে। ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কাগার নদীর তীরে মহম্মদ ঘোরীর সহিত এই দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়। যতক্ষণ পবিত্র ক্ষত্রিয় শোণিতের শেষ বিন্দু ধমনীতে বর্ত্তমান ছিল, ততক্ষণ হিন্দু সৈন্য শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিল। কিন্তু পরি-শেষে তাহাদের দেহ-রত্ন ভারত ভূমির ক্রোড়-শায়ী হইতে লাগিল। পৃথ্বীরাজ অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া শত্রু-হস্তে নিহত হইলেন। অনন্তপ্রবাহ ক্ষত্রিয়-শোণিতে ভারতের দেহকলঙ্কিত হইল, অনন্তপ্রবাহ শোণিত-সাগরে ভার-তের সৌভাগ্য-রবি ডুবিতে লাগিল, সংযুক্তার অমঙ্গল-আশঙ্কা ফলে পরিণত হইয়া গেল।

অবিলম্বে এই সাংঘাতিক সম্বাদ দিল্লীতে পঁহুছিল। সম্বাদ পাইবামাত্র সংযুক্তা চিতা সজ্জিত করিলেন, অবিলম্বে চিতানল উদ্দাত-লোল-শিখ হইয়া গগনস্পর্শী হইল। সংযুক্তা রত্নময় অলঙ্কার রাশি দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক রক্তবস্ত্র-পরিহিত ও রক্তমাল্যে বিভূষিত হইয়া এই অনলরাশিতে প্রবেশ করিলেন। নিমিষ মধ্যে তাঁহার অনুপম লাবণ্য-লীলাভূমি কমনীয় দেহ ভস্মরাশিতে পরিণত হইল। সংযুক্তার জীবনের এই শেষ অঙ্ক কি ভয়ঙ্কর! কি লোম হর্ষণ!!

পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে ছাড়িয়া যত দিন রণভূমিতে ছিলেন, তত দিন কেবল জল সংযুক্তার জীবন-রক্ষার অবলম্বন ছিল। চাঁদ কবির গ্রন্থের একটী স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সংযুক্তার এই অসাধারণ পাতিব্রত্যের বিবরণ বর্ণিত আছে। সংযুক্তা পতিব্রতার দৃষ্টান্তভূমি, স্বর্গস্থ দেবী-সমাজের বরণীয়া। পতিব্রতার শিরঃ-স্থানীয় সাবিত্রীর শ্রেণীতে তাঁহার নাম সমাবেশিত হইবার যোগ্য।

এক্ষণে প্রাচীন দিল্লীতে প্রবেশ করিলে সংযুক্তা-ঘটিত অনেক চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। যে দুর্গ সংযুক্তার লাবণ্য-লীলাতরঙ্গের বিলাসভূমি ছিল, তাহার প্রাচীর অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, যে প্রাসাদে সংযুক্তা পতিসোহাগিনী হইয়া সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্যসম্পত্তির ক্রোড়ে লালিত হইতেন, তাঁহার স্তম্ভরাজি অদ্যাপি প্রাচীন দিল্লীর ভগ্নাবশেষ সুশোভিত করিতেছে। কালের কঠোর আক্রমণে এক সময়ে এই ভগ্নাবশেষ মৃত্তিকাসাৎ হইবে, এক সময়ে এই ভগ্নাবশেষের ইষ্টক-রাশি প্রাসাদান্তরের দেহ পরিপুষ্ট করিবে, কিন্তু ইহার অধিষ্ঠাত্রী সংযুক্তা কখনও ইহ জগৎ হইতে অন্তরিত হইবেন না। তাঁহার পতিপ্রেম, তাঁহার পাতিব্রত্য, তাঁহার মহাপ্রাণতা অনন্তকাল তাঁহাকে পবিত্র ইতিহাস-হৃদয়ে জাজ্জ্বল্যমান রাখিবে।

গুরু গোবিন্দ সিংহ।

মহামতি নানক বিবিধ ধর্ম্ম-শাস্ত্র মন্থন করিয়া যে অভিনব ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন, সে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ পূর্ব্বে আত্ম-সংযত যোগীর ন্যায় নিরীহ ভাবে স্বপদ্ধতির অনুমোদিত কার্য্যানুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন। কাল-ক্রমে মুসলমানদিগের অত্যাচারে এই ধর্ম্মাবলম্বিদিগের হৃদয় বিদগ্ধ হইতে লাগিল, ইহারা পশুর ন্যায় বধ্য ভূমিতে নীত হইতে লাগিলেন, অসামান্য অত্যাচার—অশ্রুতপূর্ব্ব যন্ত্রণায় সকলের প্রাণ-বায়ুর অবসান হইতে লাগিল। এই নিদারুণ সময়ে শিখ-সমিতিতে এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলেন, তিনি স্বশ্রেণীর—স্বজাতির এইরূপ অসহনীয় যন্ত্রণা দেখিয়া জীবন্ত অধ্যবসায়—জীবন্ত উৎসাহ-সহকারে উহার প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার তেজস্বিতা, তাঁহার সাহস, তাঁহার মহাপ্রাণতা শিখদলে অনুপ্রবেশিত হইয়া তাহাদের এক নূতন জীবনীশক্তির সঞ্চার করিল। এই অবধি একপ্রাণতা, বেদনাবোধ প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সমুদয় লক্ষণ শিখহৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, এই অবধি মহাপুরুষের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শিখগণ মহাপ্রাণ—মহাসত্ত্ব হইয়া উঠিল। এই মহাপুরুষ ও মহামন্ত্রদাতার নাম গোবিন্দ সিংহ।

গোবিন্দ সিংহই প্রথমে শিখদিগকে সাম্যসূত্রে সম্বদ্ধ করেন, গোবিন্দ সিংহের প্রতিভাবলেই হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল এক ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করে। গোবিন্দ সিংহই শিখ-হৃদয়ে জাতীয় জীবনের প্রথম পরিপোষক। শিখগণ যে তেজস্বিতা, স্থিরপ্রতিজ্ঞতা ও যুদ্ধ-কুশলতায় ইতিহাসের বরণীয় হইয়া রহিয়াছে, গোবিন্দ সিংহই তাহার মূল। তেজোবত্তা ও মহাপ্রাণতায় শিখ-গুরু-সমাজে গোবিন্দ সিংহের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। ভারতবর্ষের সকলকে বিরাট মিশ্রণে এক মহাজাতিতে পরিণত করিতে নানক-প্রচারিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে গোবিন্দ সিংহের ন্যায় আর কেহই যত্ন করেন নাই।

১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নানকের মৃত্যু হইলে অঙ্গদ নামক তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য শিখদিগের গুরু হয়েন। অঙ্গদের পর অমরদাস ও রামদাস যথাক্রমে শিখ-সম্প্রদায়ের অধিনায়কতা করেন। চতুর্থ গুরুর নাম অর্জ্জুনমল। এ পর্য্যন্ত যে যে গুরু শিখদিগের অধিনায়ক হয়েন, তন্মধ্যে অর্জ্জুনেরই নানক-প্রচারিত ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশিষ্ট অধিকার ছিল। অর্জ্জুন আপনাদিগের ধর্ম্মপুস্তক আদিগ্রন্থ একত্র সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ করেন। এই সময়ে জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরু বিদ্রোহী হইয়া পঞ্জাবে অবস্থান করিতেছিলেন, অর্জ্জুন তাঁহার অনুকূলে আপনাদের ধর্ম্মশাসনোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করাতে জাহাঙ্গীর তাঁহাকে দিল্লীতে আনয়ন করিয়া কারাবদ্ধ করেন। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে কারাগারের

অসহনীয় যাতনায় অথবা ঘাতকদিগের প্রাণান্তক কুঠারাঘাতে অর্জ্জুনের মৃত্যু হয়। অর্জ্জুনের পর তৎপুত্র হরগোবিন্দ গুরুর পদে সমাসীন হয়েন। পিতার এইরূপ শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে মুসলমানদিগের প্রতি হরগোবিন্দের মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ জন্মে। এ পর্য্যন্ত শিখগণ যে নিরীহ ভাবে কালাতিপাত করিতেছিল, অর্জ্জুনমলের মৃত্যুতে সে নিরীহ ভাব অপগত হয়; প্রতিহিংসা বৃত্তি হরগোবিন্দকে অস্ত্র-ধারণ ও যুদ্ধ-কার্য্যে উত্তেজিত করিয়া তুলে। হরগোবিন্দ সর্ব্বদাই দুই খানি তরবারি ধারণ করিতেন, কেহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অম্লান বদনে উত্তর দিতেন :—"এক খানি পিতার অপঘাত মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য, অন্য খানি মুসলমানদিগের শাসন-উচ্ছেদের জন্য রক্ষিত হইতেছে"। হরগোবিন্দই শিখ-সম্প্রদায়ে অস্ত্র-শিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তক।

হরগোবিন্দের পাঁচ পুত্র, গুরুদিত্য, সুরত সিংহ, টেগবাহাদুর, অমররায় ও অটল রায়। ইহাঁদের মধ্যে পিতার জীবদ্দশাতেই সর্ব্ব জ্যেষ্ঠটীর মৃত্যু হয়। শেষ দুই জন অপুত্রকাবস্থায় পরলোকগত হয়েন, এবং অবশিষ্ট দুই জন মুসলমানদিগের অত্যাচারে পঞ্জাবের উত্তরবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গুরুদিত্যের দাহরমল ও হর রায় নামে দুই পুত্র ছিল, ইহার মধ্যে দ্বিতীয়টী হরগোবিন্দের পদ গ্রহণ করেন। ১৬৬১ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় দুই পুত্র রামরায় ও হরেকৃষ্ণের মধ্যে গুরুর পদ লইয়া মহাগোলযোগ আরম্ভ হয়। কোন প্রকারে এই

গোলযোগের মীমাংসা না হওয়াতে উভয়পক্ষ দিল্লীতে গমন করেন। সম্রাট ঔরঙ্গ্‌জেব শিখদিগকে আপনাদের গুরু নির্ব্বাচন করিয়া লইতে অনুমতি দেন, এই অনুমতি-ক্রমে শিখগণ হরেকৃষ্ণকে আপনাদের গুরুর পদে বরণ করে। কিন্তু দিল্লী পরিত্যাগের পূর্ব্বে ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বসন্ত রোগে হরেকৃষ্ণের মৃত্যু হয়; তদীয় খুল্লপিতামহ টেগবাহাদুর শিখদিগের অধিনায়ক হয়েন। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা নগরে এই টেগ বাহাদুরের ঔরসে গোবিন্দ সিংহ জন্ম পরিগ্রহ করেন।

হরগোবিন্দের ন্যায় টেগবাহাদুরও কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমশীল ছিলেন। যখন শিখগণ তাঁহাকে গুরুর পদে বরণ করে, তখন টেগবাহাদুর নম্রভাবে বলিয়াছিলেন, তিনি হরগোবিন্দ সিংহের অস্ত্র-ধারণের উপযুক্ত পাত্র নহেন। যাহা হউক, টেগবাহাদুর তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী রামরায়ের চক্রান্ত-জালে জড়িত হইয়া কারারুদ্ধ হয়েন। কারাগারে দুই বৎসর অতিবাহিত হয়, পরিশেষে তিনি জয়পুর-রাজ জয় সিংহের বিশেষ অনুগ্রহে মুক্তি লাভ করিয়া কিয়ৎকাল আসাম, পাটনা প্রভৃতি স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক পঞ্জাবে উপনীত হয়েন। পঞ্জাবে প্রত্যাবৃত্ত হইলে টেগবাহাদুর পুনর্ব্বার দিল্লীশ্বরের বিরাগ-ভাজন হইয়া উঠেন, অচিরাৎ তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয়, টেগ বাহাদুর পরাজিত ও বন্দীভূত হইয়া দিল্লীতে আনীত হইলে ঔরঙ্গজেব তাঁহার মৃত্যু-দণ্ড ব্যবস্থা করেন।

দিল্লীতে গমনসময়ে টেগবাহাদুর স্বীয় তনয় গোবিন্দকে

পিতৃদত্ত তরবারি দিয়া গুরুর পদে বরণ পূর্ব্বক এই কথা বলেন যে, মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ যেন শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্য না হয়, এবং এক সময়ে যেন এই মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হয়। গোবিন্দ পিতার এই শেষ আদেশ পালন করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। টেগবাহাদুর পুত্রের প্রতিশ্রুতিতে প্রফুল্ল হইয়া দিল্লীতে গমন করেন। এই স্থলে ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ঘাতকদিগের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়। ধর্ম্মান্ধ ঔরঙ্গ্‌জেব নিহত গুরুর দেহ প্রকাশ্য রাস্তায় নিক্ষেপ করেন।

যখন টেগবাহাদুরের মৃত্যু হয়, তখন গোবিন্দ সিংহের বয়স পঞ্চদশ বৎসর। পিতার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড, স্বজাতির ও স্বদেশের অধঃপতন গোবিন্দ সিংহের মনে এরূপ গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, যবন-বিনাশ ও যবনরাজ্য হইতে স্বদেশের উদ্ধারসাধনই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল। তিনি সকলকে একভূমিতে আনয়ন করিয়া একটী মহাজাতিতে পরিণত করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু বয়সের অল্পতা ও মোগল শাসন-কর্ত্তৃ-গণের সাবধানতা নিবন্ধন গোবিন্দ পিতার মৃত্যুর অব্যব-হিত পরেই এই সঙ্কল্পানুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন নাই। যাহা হউক, তিনি জনৈক নীচ জাতীয় লোক দ্বারা পিতার শব আনয়ন পূর্ব্বক প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিয়া যমুনার তটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করেন। এই স্থানে মৃগয়া, পারস্য ভাষা অধ্যয়ন ও স্বজাতির গৌরবকাহিনী শ্রবণে তাঁহার সময় অতিবাহিত হয়।

মোগল সাম্রাজ্য ঔরঙ্গ্‌জেবের সময়েই উন্নতির চরম

সীমায় উপনীত হয়। ঔরঙ্গ্জেব ছলে, বলে ও কৌশলে অনেককে দিল্লীর শাসনাধীন করেন। যে কয়েকটী পরাক্রান্ত রাজ্য পূর্ব্বে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, ঔরঙ্গ্জেবের সমকালে তাহা নানা কারণে উচ্ছৃঙ্খলও ক্ষমতাশূন্য হইয়া পড়ে। এক দিকে প্রতাপ সিংহের অভাবে রাজপুত-রাজ্য ক্ষীণতেজ হয়, অপর দিকে শিবজীর বিরহে নব অভ্যুদিত মহারাষ্ট্র রাজ্য মস্তকশূন্য হইয়া পড়ে। ঔরঙ্গ্জেবের সময়ে শিবজীই কেবল স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু অসময়ে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হওয়াতে ঔরঙ্গ্জেবের রাজত্ব অধিকাংশে নিষ্কণ্টক ও নিরুদ্বেগ হয়। শিবজীর অত্যয়ে ঔরঙ্গ্জেবের প্রতাপ প্রায় সকলেরই ভীতিস্থল হইয়া উঠে। মোগল সাম্রাজ্যের এই প্রতাপের সময় গোবিন্দ সিংহ শিখদিগের উপর নূতন রাজত্ব স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

যমুনার পার্ব্বত্য প্রদেশে অপরিজ্ঞাত অবস্থায় গোবিন্দ প্রায় বিংশতি বর্ষ যাপন করেন। ইহার মধ্যে তাঁহার অনেক শিষ্য সংগৃহীত হয়। গোবিন্দ পঞ্জাবে আগমন পূর্ব্বক এই শিষ্যদল লইয়া স্বীয় জীবনের মহৎব্রত সাধনে সমুদ্যত হইলেন। শিক্ষা তাঁহার অন্তঃকরণ প্রশস্ত করিয়াছিল, ভূয়োদর্শন তাঁহার বিচারশক্তি পরিমার্জ্জিত করিয়াছিল, এবং প্রগাঢ় কর্ত্তব্য-জ্ঞান তাঁহার স্বভাব সমুন্নত করিয়াছিল, এক্ষণে একতা ও স্বার্থ-ত্যাগ তাঁহার বীজমন্ত্র হইল, তিনি সাধনায় অটল, সহিষ্ণুতায় অবিচলিত ও মন্ত্রসিদ্ধিতে অনলস হইলেন। তিনি শিষ্যদিগের হৃদয়ে নূতন তেজ,

নূতন সাহসের সঞ্চার করিলেন। তাঁহার মহামন্ত্রে শিষ্যগণ সজীবতায় পরিপুষ্ট, সজীবতায় পরিবর্দ্ধিত ও সজীবতায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। গোবিন্দ এইরূপে প্রবল পরাক্রান্ত রাজত্বে বাস করিয়া সেই রাজত্বই বিপর্য্যস্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং বদ্ধমূল হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়-ক্ষেত্রে অভ্যুদিত হইয়া সেই ধর্ম্মানুশাসনেরই বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন।

গোবিন্দ সাহসী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও স্বজাতি-বৎসল ছিলেন। তিনি পৃথিবীর পাপাচার দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেন, এবং বিধর্ম্মীর অত্যাচারে আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। তিনি মনে করিতেন, মানব জাতিও সাধনাবলে মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারে, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, মানবী ইচ্ছার একাগ্রতা ও মানব হৃদয়ের তেজস্বিতা সম্পাদনার্থ এক্ষণে প্রগাঢ় সাধনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার স্মৃতি বিগত সময়ের ঋষি ও যোদ্ধৃবর্গের কার্য্যকলাপে পরিপূর্ণ থাকিত, তাঁহার কল্পনা পৃথিবীর শিক্ষাপথ সুপরিষ্কৃত করিবার উপায় উদ্ভাবনায় নিয়োজিত থাকিত, তাঁহার অন্তঃকরণ কুসংস্কারের সুদৃঢ় আবরণ ভেদ করিতে সচেষ্ট থাকিত। তিনি শিষ্যদিগকে মহাসত্ত্ব করিবার জন্য তাহাদের সম্মুখে ভূতপূর্ব্ব কাহিনী কীর্ত্তন করিতেন, দেবতাগণ কি প্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়া দৈত্যগণের উপর আধিপত্য করিয়াছেন, সিদ্ধগণ কি প্রকারে আপনাদের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন, গোরক্ষনাথ ও রামানন্দ কি প্রকারে আপনাদের অনুশাসন প্রচারিত করিয়াছেন, মহম্মদ কিরূপ কষ্ট

ও কিরূপ বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রম পূর্ব্বক আপনাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া লোকের মনের উপর আধিপত্য করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার বর্ণনীয় বিষয় ছিল। তিনি আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের একজন ভৃত্য বলিয়া উল্লেখ করিতেন, তাঁহার মতে হিন্দু ও মুসলমানদিগের অনুমোদিত ক্রিয়া-পদ্ধতি অকার্য্যকর, তাঁহার ধারণায় ঈশ্বর জ্ঞানে পুত্তলী অথবা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের উপাসনা ক্ষুদ্রতার পরিচায়ক। তিনি বলিতেন, ঈশ্বর কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে আবদ্ধ নহেন, হৃদয়ের সরলতা ও মনের সাধুতাতেই তিনি বিরাজ করিতেছেন।

গোবিন্দ এইরূপে আপনার মত প্রচার করিলেন; এইরূপে তাঁহার শিষ্যগণ পৌরাণিক কাহিনী ও উদার উপদেশ শ্রবণ করিয়া মহাপ্রাণ ও মহাসত্ত্ব হইতে লাগিল। গোবিন্দ যত্ন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিতেন, যত্নপূর্ব্বক বৈদিক তত্ত্ব ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপের পর্য্যালোচনা করিতেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াও তিনি শারীরিক তেজস্বিতা লাভের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই। কথিত আছে, তিনি নইনা পর্ব্বতে যাইয়া অর্জ্জুনের বীর্য্য, অর্জ্জুনের তেজস্বিতা লাভের নিমিত্ত গভীর তপস্যায় নিমগ্ন থাকিতেন। ঈদৃশ আত্মসংযম ও ঈদৃশ গভীর চিন্তায় শিখসমিতিতে গোবিন্দের সম্মান ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

গোবিন্দ এক্ষণে নূতন পদ্ধতিতে শিখসমাজ সংগঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শিষ্যদিগকে একত্রিত করিয়া বলিলেন :—"সর্ব্বান্তঃকরণে একেশ্বরের উপাসনা

করিতে হইবে, কোন রূপ পার্থিব পদার্থ দ্বারা সেই সর্ব্বশক্তিমান পরমপিতার মাহাত্ম্য বিকৃত করা হইবে না। সকলেই সরলহৃদয়ে ও একান্তমনে ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিবে। সকলেই একহাড় একপ্রাণ হইয়া একতাসূত্রে সম্বদ্ধ হইবে। এই সমাজে জাতির নিয়ম থাকিবে না, কুলমর্য্যাদার প্রাধান্য লক্ষিত হইবে না। ইহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, ভদ্র ইতর সকলেই সমান ভাবে পরিগৃহীত হইবে, সকলেই এক পঙ্‌ক্তিতে, এক হাঁড়িতে ভোজন করিবে। ইহা হিন্দুদিগের ক্রিয়া-পদ্ধতি, মুসলমানদিগের ধর্ম্মানুশাসন সমস্ত পরিত্যাগ করিবে, ইহা তুরুকদিগকে বিনাশ করিতে যত্নপর থাকিবে, এবং সকলকেই সজীব ও সতেজ হইতে শিক্ষা দিবে।" গোবিন্দ সিংহ ইহা বলিয়া স্বহস্তে একজন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয় ও তিন জন শূদ্রজাতীয় বিশ্বস্ত শিষ্যের গাত্রে চিনির সরবত প্রক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে খাল্‌সা* বলিয়া সম্বোধন করিলেন; এবং যুদ্ধকার্য্য ও বীরত্বের পরিচয়-সূচক "সিংহ" উপাধি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। গোবিন্দ স্বয়ংও সিংহোপাধি ধারণ করিয়া গোবিন্দ সিংহ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

গোবিন্দ সিংহ এইরূপে জাতি-গত পার্থক্য দূর করিয়া

---

* আরব্য ভাষা হইতে "খাল্‌সা" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার অর্থ পবিত্র, বিমুক্ত। যে ভূমির সহিত অপরের কোনও সংস্রব নাই, সচরাচর যে ভূমিকে খাল্‌সা বলা যায়। গুরু গোবিন্দ হইতেই শিখদিগের সাধারণ সংজ্ঞা 'খাল্‌সা' ও উপাধি 'সিংহ' হয়।

সকলকেই এক সমভূমিতে আনয়ন করিলেন, সকলের হৃদয়েই নূতন জীবনী-শক্তি ও নূতন তেজের সঞ্চার করিলেন। জাতিভেদ রহিত হওয়াতে উচ্চ বর্ণের শিষ্যগণ প্রথমে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু গোবিন্দ সিংহের তেজস্বিতা ও কর্ত্তব্যকুশলতায় সে অসন্তোষ দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। শিষ্যগণ গুরুর অনির্ব্বচনীয় তেজোমহিমা দর্শনে আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া যথানির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য-মার্গে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা একেশ্বর-বাদী হইয়া আদি গুরু নানক ও তাঁহার উত্তরাধিকারিবর্গের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল, রাজপুতদিগের ন্যায় সিংহ উপাধিতে বিশেষিত হইয়া দীর্ঘ কেশ ও দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিতে লাগিল, এবং যোদ্ধৃজনোচিত অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া প্রকৃত যুদ্ধবীরের পদে সমাসীন হইল। তাহাদের পরিচ্ছদ নীলবর্ণ হইল*। "ওয়া! গুরু জি কা খাল্‌সা! ওয়া! গুরু জি কি ফতে!" (গুরু কৃতকার্য্য হউন, জয়-শ্রী তাঁহাকে সুশোভিত করুক) তাহাদের সম্ভাষণ-বাক্য হইল। গোবিন্দ সিংহ গুরুমঠ নামে একটী শাসন-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অমৃতসরে এই সমিতির অধিবেশন হইতে লাগিল। যাহাতে সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ হয়, যাহাতে শিখ-শাসন অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে অটল থাকে, সংক্ষেপতঃ যাহাতে এক-প্রাণতা, সমবেদনা প্রভৃতি

---

* গোবিন্দ সিংহের প্রতিষ্ঠিত অকালী নামক শিখ-সম্প্রদায় অদ্যাপি নীলবর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া থাকে।

জাতীয় জীবনের লক্ষণ সমূহ শিখদিগের অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মজ্জায় প্রসারিত হয়, তাহাই গুরুমঠের লক্ষ্য হইল।

গোবিন্দ সিংহ এইরূপে ধীরে ধীরে নূতন উপাদান লইয়া নূতন শিখ-সমাজ সংগঠিত করিলেন, এইরূপে ধীরে ধীরে নব অভ্যুদিত শিখ-সমাজে রাজনৈতিক সাধারণ তন্ত্র সংস্থাপিত করিলেন, যে শিখগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিয়া সংযতচিত্ত যোগীর ন্যায় নিরীহভাবে কালাতিপাত করিত, তাহারাই এক্ষণে একহাড় একপ্রাণ হইয়া সাধারণতন্ত্র-সমাজে সম্মিলিত হইল। গোবিন্দ সিংহ জীবনের এক সাধনায় সুসিদ্ধ হইলেন, কিন্তু ইহা অপেক্ষা উৎকট সাধনা তাঁহারা সম্মুখে পতিত রহিল। তিনি পরাক্রান্ত মোগলদিগের মধ্যে সশস্ত্র খাল্‌সাদিগকে "সিংহ" উপাধিতে বিশেষিত করিয়াছিলেন, ধর্ম্মান্ধ পণ্ডিত ও পীরদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদিগকে এক সমাজে নিবেশিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাটের সৈন্য ধ্বংস করিতে পারেন নাই। গোবিন্দ সিংহ আসন্নমৃত্যু পিতার বাক্য, পিতৃ-সমীপে নিজের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিলেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া পিতৃ-হন্তা অত্যাচারী যবনদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলেন।

ভারতবর্ষের সর্ব্বাংশে মোগল শাসন বদ্ধমূল ছিল না। অন্তর্ব্বিদ্রোহ প্রভৃতিতে মোগল সাম্রাজ্য প্রায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকিত। মোগল-সাম্রাজ্যের সংস্থাপয়িতা বাবর নিরুদ্বেগে রাজত্ব করিতে পারেন নাই, তৎপুত্র হুমায়ুন পাঠান বংশোদ্ভব সের সাহের পরাক্রমে রাজ্য-তাড়িত হইয়া দেশান্তরে

ষোড়শ বর্ষকাল অতিবাহিত করেন। আকবর প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞতা ও যুদ্ধকুশলতা প্রভাবে প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষকাল ভারতবর্ষে আধিপত্য করেন, তাঁহার বিচক্ষণতায় হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে জাতিবৈরতা অনেকাংশে তিরোহিত হয়, তথাপি তাঁহাকে স্বীয় তনয় সেলিমের কঠোর ব্যবহার ও বঙ্গদেশের বিদ্রোহ-ভাবে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। সাজিহান জীবদ্দশাতেই সিংহাসন লইয়া তনয়দিগকে পরস্পার যুদ্ধ করিতে দেখেন, পরিশেষে ইহাদিগের মধ্যে অধিকতর ক্ষমতাপন্ন ঔরঙ্গ্‌জেবের ক্রূরাচারে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েন। ঔরঙ্গ্‌জেব ধর্ম্মান্ধতা ও কুটিলতায় ভারত-ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তাঁহার জঘন্য রাজনীতিতে অনেকেই তৎপ্রতি বিরক্ত ও হতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন। আকবর হিন্দু ও মুসলমানদিগকে পরস্পার ভ্রাতৃভাবে মিলিত করিতে যে যত্ন করেন, সে যত্ন ঔরঙ্গ্‌জেবের রাজ্য হইতে সর্ব্বাংশে দূরীভূত হয়। ঔরঙ্গজেবে নিজের সন্দিগ্ধতা, ধর্ম্মান্ধতা কঠিন ব্যবহারে, অনেক শত্রু সংগ্রহ করেন। এক দিকে দুর্গাদাস স্বজাতির অপমানে উত্তেজিত হইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়েন, অপর দিকে শিবজী বিধর্ম্মীর শাসনে উত্ত্যক্ত হইয়া স্বদেশীয়ের মুহ্যমান হৃদয়ে তাড়িত তেজ সঞ্চার করেন। এক্ষণে গোবিন্দ সিংহ পুনর্ব্বার এই তেজের উৎপত্তি করিয়া জাঠদিগের উপর নূতন রাজ্য স্থাপন করিতে সমুদ্যত হইলেন। তেজস্বী শিখ-গুরুর এই অভ্যুত্থান অসাময়িক ও হঠকারিতাজনক বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

গোবিন্দ সিংহ এই উৎকট সাধনায় সফল হইতে আপনার শিষ্যদিগকে এক এক দলে বিভক্ত করিয়া শিক্ষিত সৈন্য-শ্রেণীতে পরিণত করিলেন। অপেক্ষাকৃত বিশ্বস্ত ও উন্নত শিষ্যদিগের প্রতি এই সৈন্য-দলের অধিনায়কতা সমর্পিত হইল। এতদ্ব্যতীত গোবিন্দ সিংহ শিক্ষিত পাঠান সৈন্য আনিয়া আপনার দল পরিপুষ্ট করিলেন। শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত সমূহের পাদদেশে তিনটী দুর্গ প্রতিষ্ঠাপিত হইল। নাহনের নিকটবর্ত্তী পবস্ত নামক স্থানে তাঁহার একটী সেনা-নিবাস ছিল, এই সেনা-নিবাস ব্যতীত তাঁহার পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত আনন্দপুরমাখোয়ানে আর একটী আশ্রয়-স্থান তাঁহার অধীনস্থ হয়। গোবিন্দ সিংহের তৃতীয় আশ্রয় স্থান চমকোয়ার, ইহা শতদ্রুর তটে অবস্থিত। পার্ব্বত্য প্রদেশে সৈন্য স্থাপন পূর্ব্বক মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করা সুবিধা-জনক ভাবিয়া গোবিন্দ সিংহ এই দুর্গ ও আশ্রয়-স্থান সমূহ সুব্যবস্থিত করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশের সর্দ্দারদিগের সহিত সম্মিলিত ও তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করিলেন। এইরূপে ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দ সিংহ বিধর্ম্মী মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি ধর্ম্ম-প্রচারক ও ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়া নানা স্থান হইতে শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে যুদ্ধবীর সেনা-নায়কের পদে সমাসীন হইয়া সেনা-নিবেশ ও নিরাপদ দুর্গ সমূহের শৃঙ্খলা বিধানে যত্নপর হইলেন।

নাহনের সর্দ্দারের সহিত গোবিন্দ সিংহের প্রথম যুদ্ধ হয়। গোবিন্দের সেনাদলে যে সমস্ত পাঠান ছিল, বেতন

বাকি পড়াতে তাহারা গোবিন্দ সিংহের সম্পত্তি লুঠ করিবার জন্য শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করে। এই যুদ্ধে গোবিন্দ সিংহের জয়লাভ হয়। শিখ-গুরুর এই প্রথম কৃতকার্য্যতা দর্শনে অনেকেই আসিয়া গোবিন্দ সিংহের দল পরিপুষ্ট করে। ইহার কিয়ৎকাল পরে মিয়া খাঁ নামক জনৈক মোগল্ সর্দ্দার নাদোনের রাজা ভীম চাঁদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন; নাদোন-রাজ্য শ্রীনগরের উত্তর পশ্চিম ও জম্মুর দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত। জম্মুরাজ এই যুদ্ধে মিয়া খাঁর পক্ষ অবলম্বন করাতে ভীম চাঁদ গোবিন্দ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন; গোবিন্দ সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে ভীম চাঁদের সাহায্যার্থ সমর-স্থলে উপনীত হয়েন, এ যুদ্ধেও গোবিন্দ সিংহ ও ভীম চাঁদের সম্পূর্ণ জয়লাভ হয়। মোগল সর্দ্দার ও জম্মুরাজ পরাজিত হইয়া শতদ্রু উত্তরণ পূর্ব্বক পশ্চাদ্ধাবিত শত্রুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন।

মিয়া খাঁর সহিত যুদ্ধের পর দিলির খাঁর পুত্র গোবিন্দ সিংহের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন, কিন্তু শিখদিগের কৌশলে তাঁহাকেও অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। দিলির খাঁ, পুত্রের অকৃতকার্য্যতায় ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদয় সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক হুসেন খাঁকে প্রেরণ করেন। প্রথম যুদ্ধে শিখদিগের কয়েকটী দুর্গ হুসেনের অধিকৃত হয়, কিন্তু পরিশেষে তিনি পরাজিত ও নিহত হয়েন। গোবিন্দ সিংহ এই যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন না, কেবল তাঁহার অনুচরগণই বিশিষ্ট পরাক্রম প্রকাশ করিয়া এই যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল।

গোবিন্দ সিংহ ও তাঁহার শিষ্যগণের এইরূপ পরাক্রম

দর্শনে ঔরঙ্গজেব চিন্তিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া লাহোর এবং সর্হিন্দ প্রদেশের শাসন কর্ত্তাকে ইহার প্রতিবিধান করিতে কঠোর ভাবে আদেশ করিলেন। সম্রাটের এই কঠোর আজ্ঞায় এবার যুদ্ধের সমৃদ্ধ আয়োজন হইল। ১৭০১ অব্দে দিলির খাঁ ও রস্তম খাঁ গোবিন্দের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলেন। ঔরঙ্গজেবের পুত্র মোজাইমও ইঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইতে যাত্রা করিলেন। এই সম্বাদে শিখগণের অনেকে বিত্রস্ত হইয়া সন্নিহিত পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। গোবিন্দ সিংহ তাহাদিগকে ভীরু, কাপুরুষ বলিয়া অনেক তিরস্কার করিলেন, কিন্তু তাহারা নিবৃত্ত হইল না। অবশেষে ৪০ জন সাহসী শিখ, গুরুর জন্য আত্ম-প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইল। গোবিন্দ সিংহ আনন্দপুরে মোগল সৈন্যকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন, তাঁহার মাতা ও স্ত্রী, দুটী শিশু সন্তানের সহিত সর্হিন্দে পলায়ন করিলেন। কিন্তু শিশুসন্তান দুটী মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হওয়াতে নির্দ্দয়রূপে বিনষ্ট হইল। এদিকে গোবিন্দ সিংহ রাত্রিকালে মোগল সৈন্য গণের দৃষ্টি পরিহার করিয়া চম্পকুমারে উপস্থিত হইলেন।

শত্রুগণ চম্পকুমারও আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে খোজা মহম্মদ ও নহরখাঁ মোগল সৈন্যের অধিনায়ক হয়েন। যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এই সেনাপতিদ্বয় গোবিন্দ সিংহকে আত্ম-সমর্পণ করিতে অনুরোধ করিয়া একজন দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু গোবিন্দ সিংহের পুত্র অজিত সিংহ আত্মসমর্পণের প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হইয়া দূতকে তিরস্কার পূর্ব্বক বিদায় দেন। দূত তিরস্কৃত হইয়া শিবিরে প্রত্যাগত হইলে উভয়

পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। অজিত সিংহ বিশিষ্ট পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হয়েন। গোবিন্দ সিংহ জয়ের কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া অন্ধকার রাত্রিতে চম্পকুমার পরিত্যাগ করেন। প্রস্থান-সময়ে দুইজন পাঠান তাঁহাকে দেখিতে পায়, এই পাঠানদ্বয় পূর্ব্বে গোবিন্দ সিংহের নিকট উপকার পাইয়াছিল বলিয়া এ সময়ে তাঁহার বিশেষ সাহায্য করে। গোবিন্দ সিংহ এইরূপে চম্পকুমার হইতে বিলোলপুর নগরে উপনীত হয়েন। এইস্থানে পীর মহম্মদ নামে একজন মুসলমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। গোবিন্দ সিংহ পীর মহম্মদের সহিত এক সময়ে একত্র কোরাণ পাঠ করিয়াছিলেন; পীর মহম্মদ এতন্নিবন্ধন সহাধ্যায়ীর প্রতি বিশিষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করেন। গোবিন্দ পীর মহম্মদের সহিত আহার করিয়া ছদ্মবেশে ভাটিণ্ডায় উপস্থিত হয়েন। এই স্থানে শিষ্যগণ পুনর্ব্বার যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট উপনীত হয়। গোবিন্দ শিষ্যদল-সহকারে অনুসরণকারী মোগলদিগকে যুদ্ধে নিরস্ত করিয়া হান্সী ও ফিরোজপুরের মধ্যবর্ত্তী দমদমায় উপস্থিত হয়েন। যে স্থানে গোবিন্দ সিংহ মোগলদিগকে তাড়িত করেন, সেই স্থানে অদ্যাপি "মুক্তসর" নামে প্রসিদ্ধ আছে।

দমদমায় অবস্থানকালে গোবিন্দ সিংহ বিচিত্র নাটক ও একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গোবিন্দ শিখদিগের দশম গুরু। এই জন্য তৎপ্রণীত পুস্তক "দশম পাত্সা কা গ্রন্থ" নামে প্রসিদ্ধ হয়। গোবিন্দ সিংহ যে সমস্ত যুদ্ধ

করেন, বিচিত্র নাটকে তৎসমুদয়ের বর্ণনা আছে, এই বর্ণনা নিতান্ত ওজস্বী ও হৃদয়োদ্দীপক। যাহা হউক, গোবিন্দ সিংহ যখন এইরূপ নির্জ্জন বাসে পুস্তক রচনা-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে নিজের নিকট উপস্থিত হইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু গোবিন্দ এই অনুরোধ আদৌ রক্ষা করেন নাই, প্রত্যুত ঘৃণা সহকারে বলিয়াছিলেন, তিনি সম্রাটের প্রতি কোনরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। এক্ষণেও খালসাগণ সম্রাটের পূর্ব্বকৃত অপরাধের প্রতিশোধ লইবে। ইহার পর তিনি নানকের ধর্ম্ম-সংস্কার, অর্জ্জুন ও টেগ বাহাদুরের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড এবং নিজের অপুত্রকাবস্থা উল্লেখ করিয়া বলেন, "আমি এক্ষণে কোনরূপে পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ নই। স্থির-চিত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি। সেই রাজার রাজা অদ্বিতীয় সম্রাট্ ব্যতীত কেহই আমার ভীতি-স্থল নহেন"। এই উত্তর পাইয়াও ঔরঙ্গজেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পুনর্ব্বার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। গোবিন্দ সিংহ এবার সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হয়েন। কিন্তু তাঁহার পঁহুছি-বার পূর্ব্বেই বৃদ্ধ মোগল সম্রাটের পরলোক প্রাপ্তি হয়।

১৭০৭ খ্রীঃ অব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র মোজাইম্ "বাহাদুর সা" নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন। বাহাদুর সা যখন তদীয় ভ্রাতা কাম্‌বক্সের সহিত দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন গোবিন্দ সিংহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আহূত হয়েন। বাহাদুর সা গোবিন্দের প্রতি বিলক্ষণ

সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। গোবিন্দ সিংহ এইরূপে দিল্লীর সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া আপনার শিষ্য-সম্প্রদায়ের শৃঙ্খলা বিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি জনৈক পাঠানের নিকট হইতে কতকগুলি ঘোটক ক্রয় করেন। ঘোটকের মূল্যের জন্য পাঠান এক দিন গোবিন্দ সিংহের প্রতি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করে। গোবিন্দ এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া পাঠানকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড নিহত পাঠানের পুত্রের মনে গাঢ়রূপে অঙ্কিত রহিল। একদা সুযোগ পাইয়া এই পাঠান-তনয় গোবিন্দের শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করে। এই আঘাতেই গোবিন্দ সিংহ মানব লীলা সম্বরণ করেন। ১৭০৮ অব্দে গোদাবরীর তীরবর্ত্তী নাদর নামক স্থানে এই শোচনীয় কাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়। মৃত্যুর সময়ে গোবিন্দ অষ্টচত্বারিংশৎ বর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন।

গোবিন্দ সিংহ শিখ-সমাজের জীবন-দাতা। তাঁহার সময় হইতেই শিখগণ তেজস্বী বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হয়। গুরু নানক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু গোবিন্দ সিংহ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের একপ্রাণতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার নিদান। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ, তাঁহার সাধনা গভীর, তাঁহার বীরত্ব অসাধারণ এবং তাঁহার মানসিক স্থিরতা অতুল্য। তিনি সমুদয় জাতিকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ ও একধর্ম্মাক্রান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া নিজের গভীর উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি জাতীয় জীবনের গৌরব বুঝিতে পারিয়াছিলেন,

সকলে এক উদ্দেশ্যে এক সূত্রে আবদ্ধ না হইলে যে নির্জ্জীব ভারতের উদ্ধার নাই, ইহা বিলক্ষণরূপে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল; এই জন্যই তিনি হিন্দু মুসলমানকে এক ভূমিতে আনয়ন করেন, এই জন্যই তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রকে এক সূত্রে নিবদ্ধ করেন, এই জন্যই তিনি গর্ব্ব সহকারে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবকে লিখেন :—"তুমি হিন্দুকে মুসলমান করিতেছ, কিন্তু আমি মুসলমানকে হিন্দু করিব। তুমি আপনাকে নিরাপদ ভাবিতেছ, কিন্তু সাবধান! আমার শিক্ষা বলে চটক শ্যেনকে ভূতলে পাতিত করিবে"। তেজস্বী শিখগুরুর এই তেজস্বি বাক্য নিষ্ফল হয় নাই, তাঁহার মন্ত্র-বলে চটকগণ যথার্থই শ্যেনকে যথোচিত শিক্ষা দিয়াছে।

শিখ-সমিতিতে হরগোবিন্দ অস্ত্র-শিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তক। কিন্তু গোবিন্দ সিংহ সেই অস্ত্রের সহিত এমনই তেজ প্রসারিত করিয়াছেন যে, তাহাতে সমস্ত শিখ-সমাজ তেজস্বী, সাহসী ও সুযোদ্ধা বলিয়া ইতিহাসের আদরণীয় হইয়াছে। হরগোবিন্দের অস্ত্র কেবল আত্ম-রক্ষার্থ প্রয়োজিত হইত, গোবিন্দ সিংহের অস্ত্র সমস্ত ভারতকে একহাড়, একপ্রাণ করিতে ব্যতিব্যস্ত থাকিত, হরগোবিন্দের অস্ত্র সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকিয়া সঙ্কীর্ণ কার্য্য সাধন করিত, গোবিন্দ সিংহের অস্ত্র জাতি-ভেদ, বর্ণ-ভেদ না করিয়া বিস্তৃত সীমায় বিস্তৃত কার্য্য সাধনে প্রয়োজিত হইত। গোবিন্দ সিংহ অতি তরুণ বয়সে নিহত হয়েন, তিনি আরও কিছু দিন জীবিত থাকিলে অনেক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিতেন। মহম্মদ নিরাপদে

মদিনায় পলায়ন করিতে না পারিলে সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইত, গোবিন্দ সিংহ আপনার মহামন্ত্র সাধনে প্রবৃত্ত না হইলে শিখদিগের নাম ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইত। যাহা হউক, গোবিন্দ সিংহ এই অল্প বয়সে অল্প সময়ের মধ্যে শিখ-সমাজে যে জীবনী-শক্তি, যে তেজ যে ওজস্বিতা প্রসারিত করেন, তাহারই বলে, নির্জ্জীব, নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় ভারতে শিখগণ আজ পর্য্যন্ত সজীব রহিয়াছে, তাহারই বলে রামনগর ও চিলিয়ানওয়ালার নাম আজ পর্য্যন্ত ইতিহাস-হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে। গোবিন্দ সিংহের পঞ্চভূতাত্মক নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিশ্রিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি ভূমণ্ডলে অবিনশ্বর হইয়া রহিয়াছেন। যখন জনকোলাহলপূর্ণ সুশোভন নগরী বিজন অরণ্যে পরিণত হইবে, যখন শত্রুর দুরধিগম্য রাজপ্রাসাদ অজ্ঞাত, অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অদীনপরাক্রম বৈদেশিকের বিজয়-বৈজয়ন্তীতে পরিশোভিত হইবে, যখন প্রবলতরঙ্গাবর্ত্তময়ী বিশাল তরঙ্গিণী স্বল্প-তোয় গোষ্পদের আকার ধারণ করিবে, অথবা স্বল্প-তোয় গোষ্পদ বিরাটমূর্ত্তি বেগবতী নদীর ন্যায় ফেণোদ্গীরণ করিয়া অট্টহাস্যে জলধি উদ্দেশে প্রধাবিত হইবে, তখনও গোবিন্দ সিংহের মহাপ্রাণতা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, উদারতা, মহাসত্ত্ব অবনীতলে জাজ্জ্বল্যমান রহিবে, তখনও গোবিন্দ সিংহের পবিত্র নাম পবিত্র জাতীয়ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে।

সমাপ্ত।